# কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

# কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা



অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা · বারো·

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক

শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২



প্রচ্ছদ

শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রাকর :

শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১ বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

ছয় টাকা

কথাশিল্পী
শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
প্রাণাধিকেষু

# নিবেদন

মানুষের এক পরিচয়, সে গল্পপ্রিয় জীব। সভ্যতার সূচনা থেকে সে গল্প শুনেছ। গল্প শোনায় তার কখনো বিতৃষ্ণা ঘটে নি। অধুনা সাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের বিপুল জনপ্রিয়তার মূল মানবচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যে নিহিত। অথচ পুরাকাল ও আধুনিক কালের কাহিনীর চারিত্র্যে ব্যবধান মেরুপ্রমাণ।

এ'কালের ছোট গল্প ও উপন্যাসের উৎস ও রূপ সন্ধান করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সেই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী ছোট গল্প ও উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৈভবের সঙ্গে পরিচয়সাধনের ইচ্ছাও বর্তমান। যাঁদের ছোট গল্প ও উপন্যাস পড়ে পাঠক হিসেবে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত, আনন্দিত, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ হয়েছি, এখানে তাঁদের সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। আমার দাবি, গল্পখোর পাঠকের দাবি ; তার বেশি কিছু নয়।

সহযোগিতা পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে। বেশ-কিছু সংখ্যক লেখক-বন্ধু তাঁদের বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। সদাহাস্যময় সাহিত্যপ্রাণ প্রকাশক-বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অকৃপণ সাহায্য লাভ করে খুব উপকৃত হয়েছি। এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন কথাশিল্পী 'নীলকণ্ঠ'। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১লা আগষ্ট, ১৯৬১
প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলকাতা-১২

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের—

কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র-মনীষা
রবীন্দ্র-সমীক্ষা
রবীন্দ্রবিতান
বীরবল ও বাংলা সাহিত্য
বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ
রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা সংকলন
( ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে )

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ছোট গল্পের উৎস ও রূপসন্ধান | ... | ১ |
| ছোট গল্পের রূপবৈচিত্র্য | ... | ১৪ |
| বাংলা ছোট গল্প ঃ প্রথম প্রস্তাব | ... | ২৬ |
| বাংলা ছোট গল্প ঃ দ্বিতীয় প্রস্তাব | ... | ৩৭ |
| বাংলা ছোট গল্প ঃ তৃতীয় প্রস্তাব | ... | ৫৩ |
| বাংলা গল্প ও বিদেশী গল্প | ... | ৭১ |
| উপন্যাসের রূপসন্ধান | ... | ৭৭ |
| উপন্যাসের যুগে | ... | ৮৮ |
| বাংলা কথাসাহিত্যে ইয়োরোপ | ... | ৯৪ |
| যুদ্ধ ও বাংলা উপন্যাস | ... | ১০৫ |
| বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা | ... | ১১৩ |
| সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস-চিন্তা | ... | ১১৮ |
| পাঁচ বছরের বাংলা উপন্যাস | ... | ১২৫ |
| বাংলা উপন্যাসে নারীর দান | ... | ১৩৭ |
| সাম্প্রতিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস | ... | ১৫৬ |
| উপন্যাস-পাঠকের প্রত্যয়-সমস্যা | ... | ১৬৪ |

Katha Sahitya-Jijnasa
( A Treatise on Novels and Short Stories )
By Dr. Arun Kumar Mukhopadhyay

**Price : Rs. Six Only.**

# ছোট গল্পের উৎস ও রূপসন্ধান

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে—'গল্প বলো'। দিদিমা-ঠাকুরমার দল বলতে শুরু করলেন—'এক যে ছিল রাজা, তার এক রাণী'। ছেলেটি উৎসুক নয়নে উৎকর্ণ হয়ে গল্প শোনে। 'এক রাজপুত্তুর, তার তিন বন্ধু। মন্ত্রীর পুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর—'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বাস্তব পরিবেশ। ছেলেটির কল্পনা বিশাল, বিশ্বাসের ক্ষমতা বাধাহীন, আগ্রহ অপরিসীম। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধূ-ধূ প্রান্তর, তারই মাঝ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। চলতে চলতে তারা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, পথ আর ফুরোয় না।

এদিকে পাঠশালায় যেতে হয়। গুরুমশায় হাঁক দিয়ে বলেন—'নামতা পড়'। কিন্তু ছেলেটির মন তখন তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। গুরুমশায়ের আদেশ তার কানে পৌঁছয় না।

'রাজপুত্তুর আর তার তিন বন্ধু তেপান্তরের মাঠে এক গাছতলায় আশ্রয় নেয়। গাছের উপর ছিল ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী। তারা পরস্পর বলাবলি করে—আহা, এমন সোনার চাঁদগুলি কোথা থেকে এলো।

গুরুমশায় হাঁক দিয়ে বলেন—'জোরে জোরে পড়'।

ওদিকে শোনা যায় রাক্ষসের হুঙ্কার।

এদিকে গুরুমশায় হুঙ্কার দিয়ে বলেন—'তিন সাতে একুশ।'

কিন্তু তার চেয়ে জোরে হুঙ্কার দিয়ে রাক্ষস বলে—'হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ'।

ছেলেটির কানে গুরুমশায়ের হাঁক পৌঁছয় না। সে তন্ময় হ'য়ে শুনছে রাক্ষস খোক্কস, রাজপুত্তুর আর অচিন্ দেশের রাজকন্যার কথা।

সভ্যতার সূচনা থেকেই মানবশিশু গল্প শুনছে। শুধু কি মানবক, বয়স্ক মানুষও গল্প পাগল; বস্তুত মানুষের এক পরিচয় হল—সে গল্প শুনতে ভালবাসে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই গল্প সবচেয়ে প্রাচীন, সর্বাপেক্ষা আদৃত ও সর্বজন গৃহীত। তাই গল্পের উৎস সন্ধানে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে দু লক্ষ বছর, যেতে হবে বরফ যুগে।

সারা পৃথিবী তখন হিম-শীতল শুভ্রতায় আচ্ছন্ন। মানুষের তখন ভালো করে কথা ফোটে নি। লিপি আবিষ্কৃত হয় নি। তখন থেকেই মানুষ গল্প শুনছে।

কাব্য সভ্য মানুষের প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি, কিন্তু গল্প তার আগে থেকেই আছে। দু লক্ষ বছর আগে হাইডেলবার্গের গুহায় বসে মানবশিশু তার দিদিমার কাছে গল্প শুনত। গল্পের কল্পলোকে সেদিন মানুষের মন উধাও হয়ে যেতো।

একলক্ষ বছর আগেকার নিয়ানডারথাল মানুষের জীবনযাত্রার যে প্রামাণ্য উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার থেকে আমরা অনায়াসে অনুমান করতে পারি মানুষ তখন মনের ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। চতুর্থ বরফ-যুগের মানুষ যখন গুহাবন্দী ছিল তখন সে মনোভাব প্রকাশ করত গুহাচিত্রে। সে চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তা থেকেই অনুমান করতে পারি মানুষ তার ভয় ও উল্লাস প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে বেড়াচ্ছে আর মনের মধ্যে গল্পের জন্ম হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এমন কিছু কিছু গল্প প্রচলিত আছে যা নিঃসন্দেহে অতি-প্রাচীন। প্রত্ন-প্রস্তর ( প্যালিওলিথিক ) যুগের মানুষের হাজার হাজার বছর আগে থেকেই এই সব গল্প প্রচলিত ছিল। এইসব গল্পের অধিকারী ছিল দলের নেতৃস্থানীয় বুড়ো বা বুড়ীরা। যে মানুষ কিছু গল্প

সংগ্রহ করতে পারত, সে-ই নেতৃত্ব অধিকার করতো। প্রাকৃতিক বা আধিদৈবিক বিপদ কাটাবার জন্য তারা এইসব গল্পের অবতারণা করতো।

তখনকার পৃথিবীতে মানুষ ছিল অসহায় দুর্বল। ডাইনোসরাস টোরাড্যাকটিল ম্যামথ প্রমুখ অতিকায় শক্তিশালী প্রাণীদেরই তখন আধিপত্য। আদিম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির তখন অতি ধীর উন্মোচন হচ্ছে। কোনো মানবগোষ্ঠীর উপর এইসব হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হলে বা ঝড়, বজ্রপাত, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির আক্রমণ হলে এইসব আধিভৌতিক ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুশক্তিবিশিষ্ট গাঁও-বুড়োর দল ভীত মানুষদের পরামর্শ দিত, কি করে বুদ্ধির জোরে এই সকল আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এর থেকেই সূত্রপাত হয়েছে উপকথা বা Fables-এর। এইসব উপকথায় দেখানো হয়েছে কীভাবে অল্পশক্তিসম্পন্ন অথচ বুদ্ধিমান খরগোস শেয়াল তাদের বুদ্ধির জোরে হিংস্র বিশালকায় বাঘ, সিংহ, হাতীকে হারিয়ে দিয়েছে। এইসব ফেব্‌ল-এ তাই পশুর আধিপত্য। মানুষ তখনো পুরোপুরি human হয় নি। তার মধ্যে রয়েছে পশুতা বা animality। তাই উপকথায় দেখি মানুষ ও পশুর মধ্যে বেশ একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। ঈশপের গল্প বা পঞ্চতন্ত্রে এরই উন্নত গল্পরূপ পাই।

বৌদ্ধ জাতকের গল্প (খৃষ্টপূর্ব ৫৩০থেকে ৩৫০ অব্দে রচিত), পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্প (২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রথিত) ও ঈশপের গল্প (৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) পড়লে দেখি পশুসমাজ ও মানবসমাজের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাচীন গ্রীসে হেরোডোটাস (২৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) ও থিওক্রিটাস (৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) এই দুজনই গল্প-সংগ্রাহক বলে পরিচিত আছেন। আর প্রাচীন ভারতবর্ষে আছেন বহুপরিচিত বিষ্ণুশর্মা যিনি 'পঞ্চতন্ত্র' লিখেছেন। আরবদেশে পাই আরব্য-উপন্যাসের গল্প। এদের উপকথা বা ফেবল্‌স আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

উপকথার সঙ্গেই জন্ম হয়েছে রূপকথা বা ফেইরী টেল্স্ এর। রূপকথা দেশকালের অতীত। কে তার রচয়িতা, কবে তার রচনা হয়েছে —তা আমরা জানি না। বস্তুত রূপকথার লক্ষণই তাই। তা শ্রুতি-নির্ভর। মানুষের অপেক্ষাকৃত পরিণত কল্পনার নিদর্শন রূপকথা। এতে থাকবে এক রাজা, এক রাণী, এক রাজপুত্র, এক রাজকন্যা, এক গরীব চাষী, এক দৈত্য। দৈত্য এই গল্পের শয়তান। তাকে বধ করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে রাজপুত্র, গল্পের পরিণতি হবে সুখকর, মিলনান্তকঃ রাজপুত্র ও রাজকন্যা সুখে ঘরকর্না করবে।

রূপকথার রাজপুত্রের চোখে অজানার হাতছানি, রহস্যের আমন্ত্রণ, পায়ের তলায় তেপান্তরের পথ। সে উদ্ধার করে বিশাল অন্ধকার পরিত্যক্ত দুর্গম দুর্গ থেকে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে—তার শিয়রে ও পায়ের নীচে রয়েছে সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি। বিশাল দৈত্যকে পরাস্ত করে রাজপুত্র রাজকন্যাকে উদ্ধার করে। এই রাজপুত্র মানবমনের অ্যাড-ভেঞ্চারস্পৃহার প্রতীক, দুর্গম-অভিযানের পুরস্কারের প্রতীক রাজকন্যা, আর যত কু ও মন্দের (Evil) প্রতীক ঐ দৈত্যটা। মানবমনের গোপন আশা ও আকাঙ্খাই রূপকথার ছদ্মবেশে দেখা দেয়।

একালে রূপকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ডেনমার্কে অ্যাণ্ডারসন, ইতালিতে বেসিল্, জর্মানিতে গ্রিম-ভ্রাতৃদ্বয়, ফান্সে পেরোল্, ইংলাণ্ডে কাইটলি ও ক্রোকার রূপকথার সংকলন করেছেন।

রূপকের আশ্রয়ে মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস এই রূপকথা বা ফেইরী টেল্স্।

লিখিত গল্পের যে ইতিহাস আমরা পাই, তা প্রথম লেখা হয়েছে মিশরে সাড়ে পাঁচ-হাজার বছর আগে। একটি উদাহরণ দিই।

মিশরের সম্রাট হাফ্রির নামে একটি গল্প প্রচলিত। রচনাকাল প্রায় ৪৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। তখন পুরোহিত ও রাজশক্তির মধ্যে চলেছে ক্ষমতার লড়াই। সম্রাট হাফ্রি চেয়েছিলেন যাদুবিদ্যার অধিকার। আগেই

বলেছি, যাদুবিদ্যা যার হাতে সে-ই হলো সমাজের যথার্থ মালিক।

হাক্রির গল্পটি সংক্ষেপে এইঃ

এক যাদুকর পত্নী যাদুকরের প্রতি নিষ্ঠাবতী ছিল না। সে গোপনে এক সামন্তকে ভালবেসেছিল এবং সামন্তকে সেকালের রীতি অনুযায়ী মহামূল্য বস্তু উপহার পাঠিয়ে বাড়ীতে গোপনে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলো। যাদুকরের অনুপস্থিতিতে তার প্রাসাদের অন্দরমহলে হ্রদে এই বিশ্বাস-ঘাতিনী নারী তার প্রণয়ী সামন্তকে নিয়ে মনের আনন্দে নৌকাবিহার করতো। দিনের শেষে সামন্তটি ঐ হ্রদে স্নান করতো। ভৃত্য মারফত যাদুকর এই গোপন বিহারের সংবাদ পায়। যাদুকর তাকে হত্যার সংকল্প করে। একদিন ঐ সামন্ত যখন বিহার-অন্তে হ্রদে স্নান করতে নেমেছে, তখন যাদুকর সঙ্গোপনে ছোট একটা মোমের কুমীর তৈরী করে তাতে মন্ত্র পড়ে হ্রদের জলে ছেড়ে দেয়। জলে পড়ে মোমের কুমীর হয়ে গেল প্রকৃত জীবন্ত কুমীর। এই কুমীর ঐ গুপ্ত প্রণয়ীকে হত্যা করলো। তারপর যাদুকর রাজাকে সমস্ত ঘটনাটি জানালো। তখন রাজার আদেশে যাদুকরের ভ্রষ্টা পত্নীকে পুড়িয়ে মারা হলো। বিশ্বাসঘাতিনী নারীর যোগ্য শাস্তি হোলো।

বিশ্বাসঘাতিনী নারীর শাস্তিদান ও সমাজে নারীচরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন প্রাচীনকালের সকল গল্পেরই মূল কথা। মুখ্যত এগুলি নীতিমূলক গল্প। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ও সংস্থিতি রক্ষার জন্য পুরুষপ্রধান সমাজের শাসনপ্রয়াস এইসব গল্পে ধরা পড়ে।

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ডেকামেরন, হেপ্টামেরন, এমনকি চতুর্দশ শতকের খ্যাতনামা গল্পকার জিওফ্রে চসারের ক্যান্টারবেরি টেল্স্—সর্বত্রই এই সমাজশাসন বর্তমান। এই নীতিশাসনের ফলেই আমরা পেয়েছি জীবনের বহু বিচিত্র রূপ, প্রলয়ঙ্করী নারীর ছলাকলার বিবরণ, রোমান্স, অ্যাডভেঞ্চার ও ধর্মশিক্ষা।

ধর্মশিক্ষামূলক গল্পের সুন্দর উদাহরণ পাই বাইবেলে। 'ওল্ড

টেষ্টামেণ্টে' ডানিয়েল, জোশ ও রুথের গল্প এবং 'নিউ টেষ্টামেণ্টে'র গল্পগুলি (Parables) এর পরিচয়স্থল।

প্রাচীনকালের পৃথিবী একই গল্পের সূত্রে গাঁথা ছিল। আসলে ভারতের কথাসরিৎসাগর সারা পৃথিবীকেই ব্যাপ্ত করে ছিল। তার প্রমাণ পাই বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী প্রসারে। পঞ্চতন্ত্রের গল্প ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রথিত হয়। আরব্য 'বিদপাই' বা বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ আসলে বিষ্ণুশর্মা। পঞ্চতন্ত্রের বহু গল্প 'আরব্য উপন্যাসের' গল্পে পাওয়া যায়। পহ্লভী ভাষায় ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে পঞ্চতন্ত্র পারস্যে অনূদিত হয়। তার থেকে আবার সীরীয় ও আরবী ভাষায় তা অনূদিত হয়। আরবেরা তা স্পেনদেশে চালান দেয়। এবং স্পেন থেকেই তা ঈশপের গল্পে গৃহীত হয়। সপ্তম খৃষ্টীয় শতাব্দে পঞ্চতন্ত্রের গল্প চীনদেশে প্রসারিত হয়। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ, শিয়াল ও আঙ্গুরফল, সিংহ ও খরগোস, বাঘ ও ভেড়ার গল্প কে না জানে।

গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ থেকে গল্পের ধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এক বিশ্বকথাসরিৎসাগরে পরিণত হয়েছে। ঈশপ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে গ্রীসের সামোস দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তাই পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকরা বলেন, ঈশপ গল্পের জনক। কিন্তু আমরা জানি ঈশপের নামে প্রচলিত গল্পের প্রথম লিখিত প্রমাণ তাই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে। ডিমির্ট্রিয়াস ঈশপের নামে প্রচলিত গল্পের সংকলন্ করেন। কিন্তু আধুনিক ঈশপ-সংকলনে এমন সব গল্প আছে যা পঞ্চতন্ত্রে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে পূর্বোক্ত উপায়ে ভারতের গল্প পারস্য ও আরব মারফৎ গ্রীসে পৌঁছেছিল। তাই ভারতবর্ষ গল্পের জন্মস্থান, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু ভারতবর্ষে জাতক পঞ্চতন্ত্র-কথাসরিতের ধারা লোকায়ত হলেও তা রাজশক্তি ও সামাজিক অনুমোদন না পাওয়ায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। প্রাকৃতের পথে এর ধারা প্রচলিত ছিল। দেবভাষা

সংস্কৃতে এর প্রবেশাধিকার ছিল না। জাতক রচিত হয় পালিতে, কথাসরিৎ পৈশাচী প্রাকৃতে। সংস্কৃত ভাষায় এসেছে কালিদাস ভাসের কাব্য নাটক, সুবন্ধু ও বাণভট্টের আখ্যানমালা। এই বাণভট্টের কাহিনী কালিদাসের কালে মধ্যযুগের ভারতে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে কালিদাসের কাব্যে। কাদম্বরী-উদয়ন-মহাশ্বেতা-কাহিনীর নিপুণ কথক উজ্জয়িনীর চত্বরে বসে গল্পমুগ্ধ মানুষকে গল্প শোনাতো। সেই থেকেই রাজা-মহারাজার কাহিনীর ধারা প্রবাহিত হোলো। লোকায়ত গল্পের ধারা বিলুপ্ত হলো, এলো দেবদেবীর উপাখ্যান, পুরাণ কাহিনী, মঙ্গলকাহিনী।

আর ইয়োরোপে লোকায়ত ধারা সমৃদ্ধ ও বেগবতী হলো চতুর্দশ শতকে ইংলাণ্ডে জিওফ্রে চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স্-এ ও ইতালিতে জিওভান্নি বোক্কাচিও-র 'ডেকামেরন'-এ।

ইয়োরোপে মধ্যযুগে প্রচলিত কাহিনীর নাম 'রোমান্স'। পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর প্রতিপত্তি ছিল। তার-পর চসার, বোক্কাচিও, বিশেষত স্পেনের সেরভান্তেস তাঁর ব্যঙ্গ-আখ্যান 'ডন কিক্‌সট'-এর দ্বারা এর বিলুপ্তি ঘটান। গ্রীস, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের রাজারাজড়ার কাহিনীই 'রোমান্সের' উপজীব্য। রোমান্সের মুখ্য অবলম্বন ছিল রাজপ্রতিবেশে প্রণয়লীলা—সামন্তযুগীয় শৌর্যপ্রদর্শনেই এর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হোত। ইতিহাস বা পুরাণের খ্যাতনামা রাজা ও 'নাইট'রা কোনো বিপন্ন সম্ভ্রান্ত নারীকে রক্ষার জন্য অভিযান করছেন—এই ছিল রোমান্সের মূল কাঠামো। ট্রয় বা থীবসের রাজকীয় অভিযান, শার্লামেন ও তাঁর অনুচরবৃন্দের অভিযান, এবং রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটের দলের শৌর্য ( শিভ্যল্‌রি ) রোমান্স-কাহিনীতে দেখানো হোত। প্রেম-শৌর্য-নিয়তি-হিংসায় বিচিত্র এক কল্পলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হোলো 'রোমান্সে'। অনন্যাসুন্দরীর সম্মানরক্ষার্থে প্রাণবিসর্জনে উদ্যত অশেষশৌর্যগুণসম্পন্ন 'নাইটে'র কাহিনী এই জগতের মুখ্য বিষয়। এই

অভিযান কেবল ইহলোকে নয়, স্বর্গলোকেও। স্বর্গপানপাত্রের কুহকে এই জগতের মানুষের ভোলে, অন্ধকার শর্বরীতে রমণীর ক্রন্দন ধ্বনিত হয়। অশ্বখুরধ্বনিতে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। দুঃসহ বীরত্বপ্রদর্শনের পর রমণীর প্রণয় চুম্বনে বীর অভিষিক্ত হয়। দেবতা, মানব এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেয়। ট্রয়লাস ক্রেসিদা, ইকো নার্সিসাস, ভেনাস-অ্যাডোনিস ইয়োরোপা-জুপিটারের সঙ্গে দেখা দেন আর্থার, গাওয়ান, ল্যান্সলট, বীডিভীয়ার। হোলি গ্রেলের সন্ধানে নাইট স্বর্গ মর্ত পাতাল পরিভ্রমণ করেন, মৃত্যুর রাজপথে দৃপ্ত পদক্ষেপে যাত্রা করেন নাইট ও রাজকীয় পুরুষেরা। নক্ষত্রখচিত আকাশতলে প্রেম ও প্রতিহিংসার অপূর্ব দৃশ্য অভিনীত হয়।

এরপরই এল রেনেসাঁস— মানুষ ফিরে এল বাস্তবলোকে, এবারের অভিযান কল্পলোকে নয়, মানবলোকে—সমুদ্রপথে। অমরতার মিথ্যা আকাঙ্ক্ষার দিন অবসিত হলো, শৌর্যের দম্ভ অপসৃত হলো, বিজ্ঞান সাধনায় বহিঃপ্রকৃতি জয়ের ও বুদ্ধির চর্চায় ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনায় মানুষ প্রবৃত্ত হলো। অন্তঃসারশূন্য রোমান্সের মূল্যবোধকে ব্যঙ্গের আঘাত হানলেন সেরভান্তেস তাঁর অমর রচনা 'ডন কিকসট'-এ (প্রথমখণ্ড ১৬০৫ খৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ।) চসার ও বোক্কাচিও নেমে এলেন মাটির পৃথিবীতে। 'ক্যান্টারবেরি টেলস্' ও 'ডেকামেরন' গ্রন্থদুইটিতে (চতুর্দশ খৃষ্টাব্দ) ভালো মন্দয় মেশানো মানুষকে পাওয়া গেল। রঙ্গ ব্যঙ্গ, প্রেম, লালসা, সততা, ঔদার্য, মহত্ত্ব, সাধুতা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ছলনা, নীতিহীনতা, অজ্ঞতা, লাম্পট্য, অসতীত্ব, শঠতা, প্রলোভন—সব কিছুরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। চসার ও বোক্কাচিও-র কৌতূহল ঘরসংসারের প্রতি। মধ্যযুগীয় কল্পলোকের কাহিনী নয়, ফ্লোরেন্স ও ক্যান্টারবেরিযাত্রী চেনা মানুষ এই দুই গ্রন্থের নায়ক। আর সব মিলিয়ে প্রচুর পরিমাণে জীবনরস এ দুই গ্রন্থে প্রবাহিত হোলো। মধ্যযুগের অবসান ঘটল।

কিন্তু ছোট গল্প ? ছোট গল্প এলো আরো পরে। কথাসাহিত্য অর্থাৎ ছোট গল্প উপন্যাসের দেখা পাওয়া গেল আধুনিক যুগে, শিল্পবিপ্লবের পরে। বস্তুতঃ প্রশ্নমুখর আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন না হলে ছোট গল্প উপন্যাসের জন্ম হতে পারে না, এই সত্যটি স্মরণে রাখলে আমরা অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবো। উপন্যাসের জন্ম হল অষ্টাদশ শতকে। ছোট গল্প তারো পরে—উনবিংশ শতকে। এই আলোচনায় পূর্বে গল্পের যে উৎস সন্ধান করেছি, সে উৎসের ধারা মধ্যযুগের অন্তে শেষ হয়ে গেছে। ছোটগল্প উপন্যাস আধুনিক যুগের সন্তান। প্রাগাধুনিক যুগে এদের পূর্বপুরুষ সন্ধান করা নিষ্ফল শ্রম মাত্র। পূর্বেকার উপাখ্যান, বিবরণ, কাহিনী, Narrative, Parable, Fable, Episode, Tale, Anecdote চরিত্রে আধুনিক ছোট গল্প-উপন্যাস থেকে নিঃসন্দেহে ভিন্নতর। মিল এইমাত্র—মানুষ সভ্যতার সূচনা থেকে গল্পপ্রিয়, এখনো সে গল্পের জাদুতে মুগ্ধ। কিন্তু আধুনিক পাঠক সেইসঙ্গে আরো কিছু প্রত্যাশা করে—ছোট গল্পে সে চায় জীবনের কোনো ফলবান খণ্ডমূহূর্তের রূপায়ন ও সেইসঙ্গে একটি তীক্ষ্ম জীবন-জিজ্ঞাসা ; আর উপন্যাসে সে খোঁজে বিচিত্র মানবজীবনের একটি নোতুন ব্যাখ্যা।

"ছোট গল্প" একটি আধুনিক সাহিত্যিক 'ফর্ম' রূপে দেখা দিয়েছে মাত্র উনবিংশ শতকে। ঘটনার বিবৃতি মাত্র নয়, নীতিশিক্ষা নয়, রূপক রচনা নয়, বৃত্তান্ত নয় ; ছোট গল্প এক স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টি। এতে থাকবে চরিত্র, সামগ্রিক ঐক্য, সুসংবদ্ধ পরিণতি এবং একটি সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা।

ছোটগল্পের জন্ম গত শতাব্দীর ক্রমপ্রসারমান জীবনধারায়—এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ছোটগল্পে ইতিহাসগত সূচনা হলো উত্তর আমেরিকায়—ওয়াশিংটন আরভিংএর 'রিপভ্যান্ উইঙ্কল' ও ন্যাথানিয়েল হথর্ণের 'সিলেষ্টিয়াল অমনিবাস'-এ—এটিও তাৎপর্যপূর্ন ঘটনা।

জীবনের পুরনো মূল্যবোধগুলি যখন পারিপার্শ্বিকের চাপে বিনষ্ট

হয়ে যায়, প্রকাশব্যাকুল ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজচেতনার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, যখন ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সংস্কারকে দেবতাজ্ঞানে আর অর্চনা করতে পারে না, তখনই ব্যক্তির হৃদয় থেকে আর্ত জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়—'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আর ?'

ছোট গল্পের জন্ম হয় এই লগ্নে। উনিশ শতকের ইয়োরোপ আমেরিকায় এই সংঘর্ষ ও মুক্তিব্যাকুলতা, এই আত্মপ্রতিষ্ঠাবাসনা ও সমাজচেতনার বাধা দেখা দিয়েছিল। ফ্রান্সে, উত্তর আমেরিকায় ও রাশিয়ার ছোটগল্পের প্রথম প্রবর্তকত্রয়ী দেখা দিলেন—গী-দ্য-মোপাসাঁ, এডগার অ্যালান পো এবং নিকোলাই গোগোল।

ছোটগল্পের আজ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয় নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় ছোটগল্প কত বিচিত্র রকমের হতে পারে। এইচ, জি, ওয়েলস্ ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে,—

A short story is, or should be, a simple thing ; it aims at producing one single vivid effect : it has to seize the attention at the outset, and never relaxing, gather it together more and more until the climax is reached. The limits of human capacity to attend closely therefore set a limit to it ; it must explode and finish before interruption occurs or fatigue sets in.

ছোট গল্পের উদ্দেশ্য এখানে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে—'one single vivid effect'। একটিমাত্র রসমুহূর্ত সৃষ্টি করতে হবে, তারসঙ্গে অন্য কোনো রসমুহূর্ত জড়িত হবে না, এবং তা অতি প্রত্যক্ষ জীবনানুগ হবে। পাঠকের মনোযোগকে ছোটগল্প সূচনাতেই আকৃষ্ট করবে। কখনোই তাকে ঢিলে দেবে না এবং নির্ভুল দ্রুত পদক্ষেপে তা চূড়ান্তে (ক্লাইম্যাক্সে) উপনীত হবে এবং এই সূচনা থেকে চূড়ান্ত পর্যন্ত

ঘটনাপর্যায়টি মানুষের সাধ্যকে অতিক্রম করে যাবে না অর্থাৎ এক বৈঠকেই একে উপভোগ করা যাবে। ভাবের একমুখিতা, বক্তব্যের অদ্বিতীয়তা, জীবনপ্রবাহের খণ্ডচিত্রের রূপায়ণ, এবং সমস্তটির মধ্য দিয়ে লেখক-ব্যক্তিত্বের নির্ভুল প্রকাশই ছোট গল্পের সার কথা।

বিন্দুতে সিন্ধু, চূড়ামণি যোগের স্নান মুহূর্ত, ঘটনা শুক্তিতে শায়িত একটি ক্ষুদ্র নিটোল মুক্তা, ললাটলিপিতে উৎকীর্ণ একবাক্যের একটি গাঢ়বন্ধ জীবনানুশাসন, চোরা-লণ্ঠনের আলো, ছোট প্রাণ ছোট ব্যথার সরল আলেখ্য, ঘনান্ধকারের বিদ্যুৎ ঝলক—নানা অভিধায় ছোট গল্পের পরিচয় দেওয়া যায়। এইসব অভিধার মূল বক্তব্য এক, আর একটু আগেই তার আলোচনা করেছি।

আচার্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলি, "একটি ক্ষুদ্র আখ্যান-খণ্ডে সমগ্র জীবন-তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোট গল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্যখচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবনপ্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ঘটনা-ইক্ষুদণ্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট রসসারটুকুকে নিষ্কাশন করিয়া বস্তুভার-অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটর মধ্যে যে বড়র বীজ প্রচ্ছন্ন, সমগ্র জীবনের অভিপ্রায় যে দুই একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে, অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরা স্ফটিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা-তৃপ্তি ঘটায়—এই নিগূঢ় জীবন সত্যটি ছোট গল্পে বিধৃত।"

ছোটগল্পের রূপ বিচিত্র, রীতি বহুবিধ। তাই কোনো সর্বস্বীকৃত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। আর গল্পের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটানোর শ্রেষ্ঠ পন্থা গল্প পাঠ, এখানে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি অনাবশ্যক, অবাঞ্ছনীয়।

বাংলা ছোট গল্পের মুগ্ধ পাঠককে বাংলা গল্পের রস উপভোগের জন্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্পের রস আস্বাদন করতে হবে। ফ্রান্সের গী-দ্য

মোপাসাঁ, মেরিমি, গতিয়ের, আলফঁস দোদে, ব্যলজাক, ভোলত্যের, উত্তর আমেরিকার এডগার অ্যালান পো, আর্ভিং, হথর্ণ, ব্রেট গর্ট জন স্টেইনবেক, টেনেসি উইলিয়মস-আর্ণেস্ট হোমিংওয়ে, উইলিয়ম ফকনার, রাশিয়ার নিকোলাই গোগোল, আন্তন চেখফ, ম্যাক্সিম গোর্কী, পুশকিন, লিও টলস্টয়, ইতালীর আলবের্তো মোরাভিয়া, ইংলণ্ডের স্টিভেনসন, কনান ডয়ল, চার্লস ডিকেন্স, কিপলিং, সমর্সেট মম, এইচ, জি, ওয়েলস, ডি, এইচ, লরেন্স, স্টিফেন লীকক, সুইডেনের পার লাগেরভিস্ট,জর্মানির হেসে, হাউপ্টমান প্রমুখের গল্পের মাধ্যমে জীবনের বহুবিচিত্র রূপের পরিচয় পাওয়া যাবে।

গীতিকবিতা ও উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় ছোট গল্পের শিল্পকৌশলটি চমৎকার ভাবে ধরা পড়ে। উপন্যাসের ব্যাপ্তি বা কবিতার সুদূরতা ছোট গল্পের কাম্য নয়, তার সাধ্য গভীরতা, জীবনের একটি খণ্ড মুহূর্তের নিপুণ নির্বাচন এবং প্রত্যক্ষতা। ছোট গল্পে মানবজীবনের দেশকাল প্রসারিত ব্যাপ্ত চেতনা নেই, এবং নেই গীতিকবিতার সূক্ষ্মতা ও রোমান্টিক সুদূরতা। গীতিকবিতার ভাবের বহুচারিতা ও স্বচ্ছন্দ গতি সাহিত্যানুমোদন পেয়েছে, কিন্তু ছোট গল্পে ভাবের একমুখিতা, বক্তব্যের অদ্বিতীয়তা, সর্বোপরি প্রশ্নমুখিতা, স্পষ্টতা ও ঋজুতাই আরাধ্য। উন্মুক্ত বাতায়নে এক ঝলকের দেখাই ছোট গল্পের দেখা এবং তার মধ্য দিয়ে ভেতরের আসল প্রাণস্পন্দনটুকুর নিপুণ উদ্‌ঘাটনই গল্পকারের সাধনা। জীবনের অগাধ রহস্যসমুদ্রে নামার সাহস বা সাধ্য আমাদের অনেকেরই নেই, তাই সেখানে আশ্রয় হলো ছোট গল্প, কেননা গণ্ডূষে সমুদ্রের স্বাদ দেবার ক্ষমতা একমাত্র ছোটগল্পেরই আছে। ছোটগল্পের ভৃঙ্গারে জীবনসমুদ্রের যে বারি ধরা হয়, তাতেই আমরা জীবনের বহুবিচিত্র রূপকে গল্পকারের দীপ্ত ব্যক্তিত্বের আলোয় প্রত্যক্ষ করি।

ছোটগল্পের গঠনকৌশল কি ? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু বলা যেতে পারে একাগ্র কল্পনা সংহতি এবং উদ্দেশ্য

ও ফলশ্রুতির একমুখিতা অবশ্যই থাকা চাই। বিশ্ববন্দিত গল্পকার স্টিভেনসন তাঁর বন্ধু গ্রাহাম বালফ্যুরকে এই প্রশ্নের উত্তরে যে-কথা বলেছিলেন, বাল্‌ফ্যুর-রচিত Life of Stevenson থেকে সেইটি হাডসনের অনুসরণে অবিকল উদ্ধৃত করছি।

স্টিভেনসন বলছেন :

"There are, so far as I know, three ways, and three ways only, of writing a story. You may take a plot and fit characters to it, or you may take a character and choose incidents and situations to develop it, or lastly you may take certain atmosphere, and get actions and persons to realise it."

প্লটপ্রধান, চরিত্রপ্রধান এবং ইম্প্রেশনমুখ্য— এই তিন শ্রেণীর ছোট গল্পের ইঙ্গিত এখানে পাই।

দুনিয়ার সকল ছোট গল্পকেই এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অধুনা ইম্প্রেশনমুখ্য ছোট গল্পের সমাদর বেশি। এড্‌গার অ্যালান পো এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন Story of effect।

জীবনের ব্যাপ্তি বা বিশালতার রূপকার নন গল্পকার। তিনি জীবনের কোনো ফলবান খণ্ড মুহূর্তের রূপকার। তাঁর সকল শক্তি এই মুহূর্তের রূপায়নে নিযুক্ত।

# ছোট গল্পের রূপ বৈচিত্র্য

একদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় ছোট গল্প মাত্রেই রূপক কেননা তা জীবনের রূপ-কে নানা ভাবে প্রকাশ করে, বাচ্যার্থের সঙ্গে থাকে ব্যঙ্গ্যার্থ। জীবনের চলমান স্রোতের দুয়েকটি তরঙ্গ ভঙ্গকে অবলম্বন করে ছোট গল্প রচিত হতে পারে। ছোটগল্প-রচয়িতা এক অর্থে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা, তিনি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করেন, পাঠককে তার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দেন। ছোটগল্প যত ইঙ্গিতবহ হবে, যত ব্যঞ্জনাধর্মী হবে, ততই তা উচ্চতর শিল্পকর্মে পরিণত হবে। উপাখ্যান বা Tale থেকে ছোট গল্পে উত্তরণের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ঘটনাপ্রাধান্য থেকে ইঙ্গিতময়তার দিকে ছোট গল্প এগিয়ে চলেছে।

ছোটগল্পে কি থাকবে, আর কি থাকবে না, তা বলা কঠিন। বরং একথা বলা যেতে পারে ছোটগল্পে পৃথিবীর সব কিছুরই ঠাঁই আছে। তাই বিষয় অনুযায়ী ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ করার কোনো সার্থকতা নেই। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজসমস্যা, রোমান্টিক কাব্যধর্ম, ব্যঙ্গ, কৌতুক, রূপক, হাসি, ভৌতিকবিষয়, অ্যাডভেঞ্চার, উদ্ভট ও অদ্ভুত কল্পনা, গোয়েন্দা রহস্য ও ত্রাসমূলক বিষয়, শ্লেষ, এবং সর্বোপরি নরনারীর প্রেম অবলম্বন করে গল্প রচিত হয়েছে। অর্থাৎ যে-কোনো বিষয়েই গল্প রচিত হতে পারে তা গল্পকারের মনকে নাড়া দেয় বা গল্পকার তার প্রতি আকৃষ্ট হন। চলমান জীবনের যে কোনো খণ্ড মুহূর্তকে অবলম্বন করেই গল্প রচিত হতে পারে। উপন্যাসের মতো অপেক্ষা, বিবেচনা ও ধৈর্যের প্রয়োজন নেই, বিশাল পটভূমি বা ব্যাপ্ত জীবনচেতনার উপস্থিতি অনাবশ্যক, ঘটনাক্রমের সুসংবদ্ধ পরিণতির

প্রয়োজন নেই। আকস্মিকতা ছোটগল্পের প্রাণ। বিদ্যুৎচমকের সঙ্গে সঙ্গে অদেখা অন্ধকার পৃথিবীর খানিকটা উদ্ভাসিত হয়ে পরক্ষণেই অন্ধকারে যেমন বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেইরকম গল্পে জীবনের একটি মুহূর্তের ছবি ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং পাঠকমনে চিরকালের জন্য আশ্রয় নেয়।

মোপাসাঁ, দোদে, ব্যলজাক, গোগোল, চেখফ, গোর্কী, পুশকিন, এড্গার অ্যালান পো, স্টিভেনসন, ডিকেন্স, মম, লরেন্স, জয়স্, ওয়েলস, লীকক, হাউপ্টমান, হেসে প্রমুখ উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রথম শ্রেণীর গল্পকারদের গল্পরসে আমরা সবাই নিমজ্জিত হয়েছি। আমরা জানি ছোট গল্প চলমান জীবনপ্রবাহের মুহূর্তের আলেখ্য। প্রশ্নমুখিতা, অন্তর্মুখীনতা ও তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা একালের ছোটগল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই উনিশ শতক ও দ্বিতীয় বিশ্বসমরের আগেকার ছোট গল্পের রস গ্রহণ করলেই বর্ত্তমানের পাঠকের দায় মিটবে না। দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর পৃথিবীতে পুরনো মানবিক মূল্যবোধগুলির বিনষ্টি, নোতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস, পারিপার্শ্বিকের চাপে পিষ্ট ব্যক্তিত্বের অসহায়তা এবং মানবতার প্রতিষ্ঠাকামনার ছাপ পড়েছে একালের ছোট গল্পে।

তাই একালের ছোটগল্পের খানিকটা পরিচয় না পেলে ছোটগল্পের রূপবৈচিত্র্য অনুধাবন করা বাঙ্গালী গল্পপাঠকের পক্ষে সম্ভব হবে না। ছোটগল্পের আলোচনায় বারবার মোপাসাঁ বা শেখভ, পো বা মম, লরেন্স বা গোর্কীর নাম গ্রহণ করলেই বিশ্বগল্প সাহিত্যের সম্পূর্ণ ছবিটা আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠবে না। দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর ইয়োরোপ আমেরিকার গল্প থেকে ছয়েকটি রত্ন আহরণ করে এই উদ্দেশ্যেই এখানে উপস্থিতি করছি। সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য ছোট গল্পের আবেদন, আঙ্গিক কৌশল, রূপবৈচিত্র্য ও চারিত্র্য অনুধাবন করতে এগুলি সহায়তা করবে বলেই আমার ধারণা।

প্রথম গল্প বিখ্যাত সুইডিশ লেখক পার লাগেরভিস্ট এর লেখা। সম্প্রতি প্রকাশিত গল্পসংকলন The Marriage Feast and other stories থেকে এই গল্পের সারাংশ দিচ্ছি। ছোট গল্প কত ছোট হতে পারে, তার আবেদন কত মর্মস্পর্শী ও বক্তব্য কত তীক্ষ্ণ হতে পারে, তার পরিচয় এই গল্প। মাত্র দু পৃষ্ঠার গল্প, নাম 'A Hero's Death,' আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে অর্থলিপ্সা, উত্তেজনার প্রতি আকর্ষণ ও নীতিহীনতা কত বেড়ে চলেছে এবং মানবতাবোধের কত শোচনীয় অভাব ঘটেছে তারই পরিচয় এই গল্পটি। আধুনিক সমাজে 'হীরো' হবার পিছনে যে ফাঁকি থাকে, লাগেরভিস্ট তা স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন।

গল্পের ঘটনাস্থল—যে-কোনো আধুনিক পাশ্চাত্য নগরী। আমোদ প্রমোদ প্রদর্শন করে এমন একটি কোম্পানি নগরবাসীদের আনন্দ দেবার ভার নিয়েছে। তারা ঘোষণা করেছে এক যুবক নগরীর গির্জার চূড়ার উপর থেকে নীচের দিকে মাথা দিয়ে লাফিয়ে পড়বে। এর জন্য কোম্পানী যুবকটিকে দেবে পাঁচলক্ষ ডলার। এই তামাশা দেখার জন্য কোম্পনী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, দর্শনী দিলেই প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে। টিকিট বিক্রয় হচ্ছে, নগরবাসীদের মধ্যে চড়াদামে টিকিট কেনবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। নগরীর সর্বত্র সেই যুবকের ছবি, সংবাদপত্রে ফলাও বিজ্ঞাপন। উত্তেজনার অন্ত নেই। যুবকের সম্বন্ধে কৌতূহলের শেষ নেই। এতদিন কে তাকে চিনত? এখন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রত্যহ তার ছবি বেরোচ্ছে। তার জীবন, তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার 'হবি'—সব কিছুরই খবর বেরোচ্ছে। বাড়িতে, গাড়িতে, আপিসে, রেস্তোরায়, খেলার মাঠে, ট্রাম-বাসে হৈ-হৈ -রৈ-রৈ। সর্বত্রই এই নিয়ে আলোচনা। এদিকে চড়া দামে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। নির্ধারিত দিনে সকলে গির্জাপ্রাঙ্গণে জড় হোলো। তামাসা দেখার জন্য জনসমুদ্র সৃষ্টি হল।

নির্ধারিত সময়ে যুবকটি গির্জার চূড়া থেকে হাত নাড়ল, প্রত্যুত্তরে

সেই বিশাল জনসমুদ্র উল্লাসধ্বনি করল। তারপর যুবকটি মাথা নীচের দিকে করে লাফিয়ে পড়ল। তারপর—? আরকি, খেলা শেষ হয়ে গেছে, কোম্পানীর অনেক টাকা লাভ হয়েছে। আর যুবকটির কি হলো? চূড়া থেকে পড়ে তার মাথাটা চূর্ণ হয়ে গেছে, হাত-পা থেঁৎলে মাংস হাড় চুরমার হয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে। যারা চড়া দামে টিকিট কিনে তামাশা দেখতে এসেছিল, তারা বাড়ি ফিরে গেল একটি প্রশ্ন নিয়ে। 'এমনি করে প্রাণ দিয়ে লাভ কি?'—

এই গল্পের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, সুগভীর বেদনা, বক্তব্যের অতিস্পষ্টতা ও প্রশ্নমুখিতা নিতান্ত অমনোযোগী গল্পপাঠকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। কত স্বল্প আয়োজনে কত গভীর আবেদন সৃষ্টি করা যায়, লাগেরভিস্টের গল্পটি তারই সুন্দর উদাহরণ।

দ্বিতীয় গল্পটি লিখেছেন ভল্‌াদিমির নবোকভ, যাঁর লেখা 'লোলিটা' উপন্যাস পড়ে আমরা একবাক্যে ছি-ছি করে উঠেছি। নবোকভ সাম্প্রতিক কালের ইংরেজি গদ্যের অন্যতম কুশলী শিল্পী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর জন্ম জার-আমলের রাশিয়ায়, বর্তমানে তিনি উত্তর আমেরিকায় বাস করেন, আমেরিকান্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্য পড়ান। সম্প্রতি 'Nabokov's Dozen' নামে তাঁর একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনের একটি গল্পের সারাংশ এখানে দিচ্ছি। এই গল্পপাঠে আমাদের ধারণা হবে যে নবোকভ যৌনলালসাসর্বস্ব লেখক নন, আমেরিকা কেবল উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেনা এবং পাশ্চাত্য জগৎ কেবল পঞ্চ ম-কারেই জীবনের অর্থ সন্ধান করে না, মহত্তর জীবনস্বপ্নের পিছনেও ছোটে। গল্পটির নাম— 'The Aurelian'।

গল্পটি এক স্বপ্ন-পাগল মানুষের কাহিনী। সংসারযুদ্ধে পরাজিত, হতোদ্যম, দরিদ্র, ভগ্নস্বাস্থ্য একটি মানুষ, তার স্ত্রী ও তার ছোট্ট দোকান —এই নিয়ে গল্প। লোকটির নাম, পল পিলগ্রাম।

এই দোকান আগে ছিল প্রজাপতি বিক্রির দোকান, এখন দিনকাল মন্দা, প্রজাপতি সংগ্রহের নেশা এখন আর মানুষের নেই। তাই পিলগ্রামকে অন্য কিছু, যেমন ইশকুলের ছেলেদের খাতা-পেন্সিল বিক্রি করতে হয়। তবু দিন চলে না। সেই অন্ধকার ঠাণ্ডা দোকানঘরেই তাদের সংসার। হেরে-যাওয়া পিলগ্রাম কিন্তু কেবলই স্বপ্ন দেখে, কবে হাতে দু পয়সা হবে, সে যাবে এই নিরানন্দ দোকানঘর ছেড়ে সূর্যালোকিত দক্ষিণ ফ্রান্সে, স্পেনে, মেক্সিকোয়, সে সংগ্রহ করবে রঙীন প্রজাপতি। কিন্তু হায়, সে শুধু স্বপ্ন। তার স্ত্রী ইলিনর ভাবে, কবে দুঃখ ঘুচবে। আর পিলগ্রাম ভাবে, কবে দূরদেশে প্রজাপতি-সংগ্রহে যাবে। বারদুয়েক চেষ্টা করেছে, অবস্থাগতিকে কোনোবারই যেতে পারে নি।

এক নামকরা মৌমাছি-সংগ্রাহকের বিধবা এক সেট মৌমাছি পিলগ্রামকে দিয়েছিল কমিশনে বিক্রির জন্যে। পিলগ্রাম ভেবে রেখেছে ঐ সেট এক হাজার মার্কে বিক্রি করবে, ঐ বিধবাকে পঞ্চাশটি মার্ক দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে বিদেশে যাবে। বহুদিন তা অবিক্রীত পড়ে আছে। এর কোনো ক্রেতাই আসে না। অবশেষে এক এপ্রিল-প্রভাতে এলেন এক ধনী ক্রেতা। হাজার মার্কেই তিনি ঐ সংগ্রহ কিনলেন।

এবার পিলগ্রামের স্বপ্ন সফল হবার দিন এলো। ন'শ' পঞ্চাশ মার্ক নিয়ে প্রজাপতি সংগ্রহের জন্যে স্পেনে যাবার জন্য তৈরি হলো। যেদিন যাবে সেদিন রাতে ইলিনর গেল এক নিমন্ত্রণে। পিলগ্রাম মুখে বল্‌ল—'তুমি যাও, আমি একটু পরে যাবো'। কিন্তু সে একটি চিঠি লিখে রেখেছে—'ইলিনর। স্পেনে চললাম। কোনো কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করো না। প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার নিয়ে চালাও। পরে চিঠি দেবো। গিড়গিটিগুলোকে খেতে দিও।'

ইলিনর গেল নিমন্ত্রণে। তার ধারণা পিলগ্রাম একটু পরেই আসছে। প্রজাপতি ধরার সরঞ্জাম, পোষাক, টাকা সব কিছুই পিলগ্রাম সুটকেসে

ভরেছে। এবার তৈরি। ট্রেণের সময় হয়েছে। পিলগ্রামের ছিল হৃদরোগ। বারদুয়েক আক্রমণ হয়েছে। পিলগ্রাম তা গ্রাহ্য না করেই বেরুল। বেরিয়ে মনে হলো, ভুল হয়েছে, কিছু খুচরো টাকা পয়সা আনা দরকার ছিল। ফিরে এসে অন্ধকারে খুচরো টাকার পাত্র থেকে তাড়াতাড়িতে পয়সা নিতে গিয়ে সেটা পড়ে ভেঙে গেল। পিলগ্রাম নীচু হয়ে পয়সা কুড়িয়ে নিচ্ছে। হাতে আর সময় নেই।

ইলিনর নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরেছে। ভাবল, কই, পিলগ্রাম তো গেল না। একি ঘরে কেউ নেই? চাবি যথাস্থানে আছে, দরজা খোলা কেন? হাতে ঠেকল একটা কাগজ। চিঠিটা পড়ল—'আমি স্পেনে চল্‌লাম।' অন্ধকার ঘর। ইলিনরের মনে হলো, এবার সে একা—একেবারে নিঃসঙ্গ।

গল্পের শেষ এখানে। না, না, আর একটা বর্ণনা আছে। ইলিনর টের পেল ঘরের মেঝেয় কী-যেন পড়ে আছে। আলো জ্বালল, দেখল—সেই ঠাণ্ডা মেঝেয় স্যুটকেশ আর ছড়ানো মুদ্রার মাঝে পড়ে আছে পিলগ্রাম। সে আর কোনদিন জাগবে না, স্পেনে প্রজাপতি-সংগ্রহে যাবে না।

এখানেই গল্পের সমাপ্তি। সমস্ত গল্পটার মধ্যে সমবেদনা ফল্গুর মতো প্রবাহিত। গল্পের শেষে যে কারুণ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা পাঠকমনকে আচ্ছন্ন করে। জীবনের অন্য এক অর্থ খুঁজেছিল পিলগ্রাম। সারা জীবন প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সে লড়েছে, কিন্তু সুযোগ যখন এল, তখন আর তার হাতে সময় নেই। প্রতীকধর্ম্মী এই গল্পের গভীর ব্যঞ্জনায় পাঠক নবতর জীবনচেতনায় উন্নীত হয়, একটি অনাস্বাদিত জীবনের স্বাদ পায়। এই গল্পের শেষ চমক অপেক্ষা করেছিল শেষ বর্ণনার জন্য। পূর্বোক্ত গল্পের প্রশ্নমুখিতা ও তীব্র জিজ্ঞাসা এখানে নেই, কিন্তু নবোকভের এই গল্পে জীবনের একটি নোতুন অর্থ পাই। এখানেই এই গল্পের সার্থকতা।

তৃতীয় গল্পটির রচয়িতা ধনামধন্য ইতালীয় গল্প লেখক আলবের্তো মোরাভিয়া। সমরোত্তর ইতালীয় কথাসাহিত্যে তাঁর নাম পুরোভাগে। তাকে আমরা জানি 'উওম্যান অফ্ রোম' উপন্যাসের রচয়িতারূপে এবং সে-কারণেই তাঁকে অশ্লীল লেখক বলে মনে করি। সবিনয়ে জানাই, এই ধারণা ভ্রান্ত। মোরাভিয়া জীবনশিল্পী, সে-কারণেই যৌন-বাসনার ছবি আঁকতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। মোরাভিয়ার উপন্যাস সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাঁর গল্পের সাফল্য সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই।

রোমের বিচিত্র জীবনযাত্রায় মোরাভিয়া মহৎ ও সুন্দরকে নয়, অসুন্দর ও বর্বরের মধ্যেই জীবনকেই অন্বেষণ করেছেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গল্পসংকলন Racconti Romeni বা Roman Tales এই জীবনানুরাগের পরিচয়স্থল। এই সংকলনের একটি গল্পের সারাংশ এখানে দিচ্ছি। মোরাভিয়ার সকল গল্প-উপন্যাসের মতোই এই কাহিনী উত্তম পুরুষের জবানীতে কথিত। বস্তুত এই আঙ্গিক কৌশলে মোরা-ভিয়া বিরল সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর গদ্যের ধাবৎশক্তি অনুবাদে ও বর্তমান। গল্পটির নাম 'Rain in May'—গ্রীষ্মপ্রধান মে মাসের বর্ষাধারায় গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি। উত্তম পুরুষের জবানীতেই গল্পের সংক্ষিপ্তসার এখানে দিচ্ছি, তাতে গল্পের রসোপভোগে ও লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয়লাভে সহায়তা হবে।

নায়ক বলছে :

এই মে মাসের অঝোর বৃষ্টিধারায় মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন আমি গ্রাম থেকে রোমে এলাম। মন্টিমারিও অঞ্চলের ঐ সরাই-খানায় হঠাৎই এসে পড়েছিলাম। মালিক আন্তনিও তোচ্চি 'ওয়েটার' হিসেবে আমাকে চাকরি দিল থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে, বেতন দেবে না। ভাবলাম এক পরিবারে আশ্রয় মিলল, কিন্তু পরে দেখলাম এতো আশ্রয় নয়, নরক। বাপ, মা ও মেয়ে—তিনজনে সরাইখানা

চালায়। বাপ আন্তনিওর বিশাল দেহ, জঘন্য মেজাজ, ও সাপের মত চোখ। মেয়ে ডার্সির মেজাজ ব্যবহার বাপের মতোই, রূঢ়ভাষিণী অভদ্র, কিন্তু সে রূপবতী, চলনের ঠমকে সে যেন প্রতি পদেই ঘোষণা করে—এ তুনিয়া আমারই। কেবল মা-ই এই তিনজনের মধ্যে শান্ত মেজাজের, মনে হয় আধ-পাগল।

সরাইখানার নামের খুব বাহার। একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে "অন্তারিয়া দেই ক্যাসিয়াতোরি, মালিক আন্তনিও তোচ্চি।" পুরোনো ভাঙা বাড়িতে সরাইখানার বড় খাবার ঘর আর বাগানে গাছ-পালার মাঝে টেবিল পাতা। গ্রীষ্মকালটাই সবচেয়ে ভাল সময়। রোমের লোকেরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এখানে বাগানে ব'সে মদ ও খাবার খেত। সামনে রোমের সামগ্রিক দৃশ্যটি দেখা যায়। এটাই লোকে পছন্দ করতো।

খাটুনির অন্ত নেই। আমরা তুজন পুরুষ পরিবেশন করতাম এবং তুজন নারী রান্না করতো, বাসন ধুতো। একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতাম। কাজের চাপে অন্য কোন বিষয়ে মন দেবার অবকাশ থাকত না।

শীতে বা বর্ষায় গোলমাল বাধত। তখন খরিদ্দার কম, অবসর বেশী। বাপ ও মেয়ে পরস্পরকে ঘৃণা করতো বললে কম বলা হয়। তারা পরস্পরকে হত্যা করতে পারলে খুশি হতো। বাপের জঘন্য মেজাজ, যে-কোনো তুচ্ছ ব্যাপারে তার খুন চেপে যেতো। বাগানে একটা নাচের মঞ্চ তৈরী করতে ও বাড়িটাকে আধুনিক ঢঙের রেস্তোরাঁয় পরিণত করতে চাইত মেয়ে। এতে আয় বাড়বে। বাপ কিছুতেই তা'তে রাজি হতো না। এই নিয়ে তর্ক ও ঝগড়া। ঝগড়া করতে করতে আন্তনিও ডার্সিকে ঠাস করে এক চড় মারতো। মেয়ে উল্টে গাল দিতো। বাপ চুলের মুঠি ধরে ঘুষি চালাতো। মা তুজনকে ছাড়াবার চেষ্টা করতো, কিন্তু নিঃশব্দে হাসতো। অসহ্য নারকীয় অবস্থা!

আমি অনেকদিন আগেই কাজ ছেড়ে চলে যেতাম। যেতে পারছিলাম না ডার্সির জন্যে। তাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। ডার্সিও তা জানতো। সে বুঝেছিলো আমি তার ফাঁদে পড়ে গেছি। তবে সে রক্তমাংসের জৈবিক ভালবাসাই বুঝতো। যেদিন আমি প্রথম এখানে আসি সেই রাতেই সে আমার ঘরে এসেছিলো। এবং আমাকে ঘুম থেকে যৌন-সম্ভোগের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গোপন ছিলো, বাইরে তার প্রকাশ ছিলো না। ডার্সি উদ্ধত রূঢ়ভাষিণী ছিলো, তবে একনিষ্ঠা ছিলো। এ জন্যেই আমি তার কাছে বাঁধা পড়ে গেছিলাম।

আমি লোকটা সহজে কোনো কিছু করি না। চট করে ভালবাসায় গলে যাই না বা হঠাৎ আমার মাথায় খুন চাপে না। আমি রেগে যেতাম যদি কেউ আমায় খোঁচাতো, তার ফলে আমার ফর্সা মুখ লাল হয়ে যেতো। ডার্সি এটা বুঝতে পেরেছিলো বলেই আমায় প্রায়ই খোঁচাতো। কিছুদিন বাদে বুঝলাম এর কারণ—সে আমাকে তার বাপের বিরুদ্ধে লড়াতে চাইতো। সে প্রায়ই বলতো—আমি একটা কাপুরুষ কেননা তার বাপের অত্যাচার থেকে আমি তাকে রক্ষা করি না। বুড়ো আন্তনিও একদিন ডার্সিকে মাটিতে ফেলে লাথি পর্যন্ত মেরেছিলো। ডার্সি চাইতো আমি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিই। সেজন্যেই সে আমাকে ভীরু অপদার্থ বলতো। আমি আর প্ররোচনা ঠেকাতে পারছিলাম না।

একদিন ডার্সি বলল, সে আর আমি দুজনে মিলে যদি এখানে নোতুন করে আধুনিক ঢঙে একটা রেস্তোরাঁ খুলি, তা খুব সুন্দর হয়, আয়ও বাড়ে। সেদিন ডার্সিকে খুব মিষ্টি ভদ্র স্নেহশীলা বলে আমার মনে হয়। তারপর সে তার আসল মতলবটা খুলে বললো—যতদিন তার বাপ আছে, আমরা বিয়ে করি আর না করি কিছুই করতে পারবো না। তাই সংক্ষেপে অবস্থা দাঁড়ায় এই—বাপকে খুন করা দরকার।

সে আমাকে ভাবনার অবকাশ দিল না, প্রথম রাতের মতো এই মতলব হঠাৎ আমার ওপর চাপিয়ে দিল।

পরদিন আমি তাকে বললাম, এটা ভুল হচ্ছে, এটা অন্যায়। ফলে সে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা বন্ধ করে দিলো। আমি তখন ধীরে ধীরে বুড়ো আন্তনিওর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছি—তার জন্যেই ডার্সি আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আমি বুড়োকে আরো বেশি ঘৃণা শুরু করলাম।

আবার মে মাস এলো। অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। কাজের চাপ কম্‌লো। বাপে মেয়েতে আবার ঝগড়া লাগলো। একদিন তুমুল ঝগড়া। বাপ মেয়েকে ঠেসে চড় মারলো। আমি আর থাকতে পারলাম না। বাপকে বাধা দিতে গেলাম। ভাবলাম এভাবেই ডার্সিকে ফিরে পাবো। বুড়োর সঙ্গে আমার ঝগড়া বেধে গেলো। রাগে দিশেহারা হয়ে এক পাত্র মদ বুড়োর মুখে ছুড়ে দিলাম। বুড়ো লাফ দিয়ে চীৎকার করে উঠলো—তোকে খুন করবো। আমি সিঁড়ির ওপরে নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। জানালার বাইরে দেখি অঝোর ধারায় মে মাসের বৃষ্টি পড়ছে।

তখন আমি ডার্সির মতলব কাজে পরিণত করায় সম্মতি দিলাম—বুড়ো আন্তনিওকে হত্যা করবো। ডার্সি পরিকল্পনা ঠিক করল। মাটির নীচে 'সেলার'—মদের ভাঁড়ার। রোজ সকালে বুড়ো আন্তনিও সেখান থেকে মদ নিয়ে আসে খরিদ্দারদের জন্য। তখনো আমি দ্বিধাগ্রস্ত। ডার্সি বুঝিয়ে বললো—যখন বুড়ো সেলারে ঝুঁকে পড়ে মদের বাক্স থেকে মদ নেবে, ঠিক সেই সময় আগুন উস্কে দেবার লোহার রড দিয়ে বুড়োর মাথা ফাটিয়ে ফেলবে। তাহলেই কার্যসিদ্ধি। ডার্সি আমার সকল দ্বিধা ভয় ফুৎকারে উড়িয়ে দিলো। পুরুষকে লোভ দেখাতে ও নিজের পথে আনতে রূপবতী যৌবনবতী ডার্সি সিদ্ধহস্তা।

অবশেষে সেই স্মরণীয় সকাল এলো। সেই সকালেও বৃষ্টি হচ্ছে।

সব দিক অন্ধকার। কোথাও সূর্যালোক নেই। আন্তনিও ও ডার্সি সেলারে নেবে যাচ্ছে। ডার্সি নেবে যাবার আগে 'সব ঠিক আছে' ইঙ্গিত করে গেলো। তার মা তা দেখতে পেলো। আমি যখন চুল্লিড় কাছ থেকে লোহার রডটি নিতে যাচ্ছি, তখন তাকিয়ে ডার্সির মায়ের মুখ দেখে বুঝলাম, বুড়ি সব বুঝেছে, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। নীচের সেলার থেকে আন্তনিওর আহ্বান ভেসে আসে—ডার্সি, ডার্সি। সে বললো—যাচ্ছি—নেবে যাবার আগে তার অঙ্গভঙ্গীতে যৌবনের ঝড় তুলে আমাকে ইসারা করে গেল। আমি লোহার রড হাতে নীচে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভিজতে ভিজতে বাইরে থেকে এক গাড়োয়ান এলো। এসেই বললো—'এখুনি এসো, আমাকে একটু সাহায্য করো।' আমি রডটি হাতে করে সেই মুহূর্তেই তার সঙ্গে বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে রাস্তায় এলাম। তার পাথর-ভরা গাড়িটা কাদায় বসে গেছে, ঘোড়াটা টানতে পারছে না। আমি রডটা বাগানের দরজার খুঁটির মাথায় রেখে গাড়ির চাকা কাদা থেকে উদ্ধারে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। প্রবল বর্ষণ, প্রচুর কাদা। আমরা দুজনে কিছুতেই গাড়িটা ঠেলতে পারলাম না। সেই রুক্ষদর্শন পরুষভাষী গাড়োয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোড়াকে চাবুক মারতে লাগলো। ঘোড়াটা কিছুতেই এগোতে পারে না। তখন ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান সেই লোহার ছুঁচালো রডটি হাতে নিলো। সে যে কেবল ঘোড়াটার ওপর চটেচে তা নয়; তার সমস্ত দুর্ভাগ্য জীবনের ওপরেই চটেছে। আমি ভাবলাম সে বুঝি ওটা দিয়ে ঘোড়াটাকেই খুন করে। বারণ করতে গেলাম, পারলাম না। ওটা দিয়ে আমিই তো বুড়োকে খুন করতে যাচ্ছিলাম। আমার মনে হলো, আমার সমস্ত ক্রোধ যেন গাড়োয়ানে বর্তেছে। আমি বেঁচে গেলাম। হতভাগ্য দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত বঞ্চিত ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান সেই রডটি দিয়ে ঘোড়ার মাথায় সজোরে আঘাত করলো। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

যখন চোখ খুললাম, দেখি ঘোড়াটা কাদায় পড়ে গেছে। তার রক্ত মিশেছে কাদায় ; ঘোড়াটা দুবার পা ছুঁড়ল, তারপর শেষ হয়ে গেল। তখন হত্যাকারী গাড়োয়ান নিবৃত্ত হলো, রডটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আমি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম, সামনের দিকে সেই প্রবল বৃষ্টিতে হাঁটতে শুরু করলাম। বড় রাস্তায় পৌঁছে প্রথম যে রোমগামী ট্রাম পেলাম তাতে লাফ দিয়ে উঠলাম। তখন একবার পিছন ফিরে তাকালাম—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। শেষবারের মতো দূরে আবছাভাবে সরাইখানা ও তার সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলাম।

জীবনানুরাগী শিল্পীর হাতে পড়ে একটা সাধারণ লালসা হিংসার গল্প কীভাবে মহত্তর ব্যঞ্জনায় উন্নীত হতে পারে, মোরাভিয়ার এই গল্পটি তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গল্পের উপস্থাপন-কৌশল লক্ষ্য করার যোগ্য। উত্তম পুরুষের জবানীতে কথিত এই গল্পে তিনটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য মোরাভিয়া নৈপুণ্য সহকারে রক্ষা করেছেন। গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তটি এসেছে একেবারে শেষে। অথচ সারা গল্পেই তার ইঙ্গিত রয়েছে। একটি অপ্রত্যাশিত মোচড় দিয়ে লেখক গল্পের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গল্পটি প্রতীক ব্যঞ্জনায় গভীর অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক ইতালীয় সাহিত্যের 'নিও-রিয়ালিজম'-এর সার্থক প্রয়োগ হয়েছে এই গল্পে। এই গল্পের মানবিক প্রবৃত্তির যে আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে, তার ফলশ্রুতি উত্তেজনা নয়, আত্মসচেতন বিশ্লেষণ। এই চেতনার আলোকে গল্পের নায়ক আত্মবিশ্লেষণ করে সমূহ বিনষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আশা করা যায়, সাম্প্রতিক পাশ্চাত্ত্য গল্পের এইসব ইঙ্গিত আমাদের গল্পসাহিত্যে ফলপ্রসূ হবে।

# বাংলা ছোটগল্প : প্রথম প্রস্তাব

বাংলা ছোটগল্পের আকাশ আজ প্রসারিত হয়েছে। প্রায় ষাট বছর ধরে ছোটগল্প লেখা হচ্ছে। সেই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ—রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও বেদনা, আনন্দ ও প্রেমে পরিপূর্ণ, মানবিক চেতনায় উজ্জ্বল 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম ফসল প্রকাশিত হল। 'দেনাপাওনা', 'গিন্নী', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নর কীর্তি', 'পোষ্টমাষ্টার' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প এই বছর প্রকাশিত হল। 'দেনাপাওনা' গল্পের নিষ্ঠুর সমাজ সমালোচনার ওপরে সেদিন 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের বেদনার সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছিল। অর্থাৎ তীব্র-তীক্ষ্ণ জীবন-সমালোচনা সেদিন প্রাধান্য পায় নি, তার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। সেদিন কিশোরী রতনের হৃদয়বেদনার স্নুমিত প্রকাশই ছিল বড় কথা। বাংলাদেশের শ্যামল-স্নিগ্ধ প্রকৃতি তখনকার গল্পের ধাত্রী। বাংলাদেশের পারিবারিক জীবন ছিল গল্পের সঞ্চরণ-ভূমি। 'ছুটি', 'সমাপ্তি', 'অতিথি' প্রমুখ গল্পগুলি গীতিকাব্যের সুষমামণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। একান্ত পরিচিত গ্রাম-জীবনে অতি সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রায় মাঝে মাঝে যে দু-একটি অসাধারণ কাব্যগুণসমৃদ্ধ মুহূর্ত দেখা যায়, তাকে ধরে রাখাতেই গল্পরচনার চূড়ান্ত সাফল্য বলে সেদিনের গল্পলেখক মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থেকে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পর্যন্ত ভারতী-যমুনা-প্রবাসী-ভারতবর্ষ-সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে এই জীবনচিত্রণ এবং আনন্দ-সম্ভোগের ধারাটি প্রবহমান ছিল। বাংলা ছোটগল্পের ভূগোল ও আকাশ পরিবর্তিত বা প্রসারিত করার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। গল্পের আর একটি যে জগৎ ছিল তা রোমান্সের স্বপ্নলোক—সেখানে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র

হাহাকার শোনা যায়। প্রবাসী বাঙালীর জীবনকে নিয়ে যাঁরা গল্প লিখেছেন, তাঁরা এই ধারারই অনুসারী। উত্তর-ভারতে বাঙালীর বসবাস যে-সব শহরে, সেখানকার পটভূমিতে রচিত গল্পে বাঙালী চরিত্রই বড় কথা, স্থানীয় পরিবেশ বা সমাজ সেখানে কৌতূহলের কেন্দ্র ছিল না। প্রভাতকুমার, প্রেমাঙ্কুর, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ গল্পকার বাঙালী-টোলার কথা লিখেছেন, তার বাইরে উত্তর-ভারতের গ্রাম বা শহরের অবাঙালী মানুষকে নিয়ে গল্প লেখেন নি। অর্থাৎ সেদিনের গল্পলেখক ছিলেন গৃহগত-প্রাণ। ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, গণ্ডীবদ্ধ বাঙালী জীবন—এই হল সেদিনের গল্পের ভূখণ্ড। রবীন্দ্রনাথের "বর্ষাযাপন" কবিতায় এই মানস-পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘন ঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে না হইল শেষ।"

গীতিকবিতার একমুখিতা, ভাবের সংহতি, পরিবেশ-রচনায় কাব্য-সুরভি যোজনা সেদিনের গল্পরচনায় সাধনীয় কর্ম ছিল।

বাংলা ছোটগল্পের আকাশে রঙ বদলানোর প্রথম ইঙ্গিত দিলেন স্বনামখ্যাত প্রমথ চৌধুরী। ওই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দেই সে ইঙ্গিত পাওয়া গেল 'সাহিত্য' পত্রিকার ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রমথ অনূদিত একটি গল্পে। গল্পটির নাম "ফুলদানি", মূল লেখক প্রস্পার মেরিমে। প্রমথ চৌধুরী এঁর লেখা আর একটি গল্প "কার্মেন" অনুবাদ

করেছিলেন, তা অসম্পূর্ণ। সহাস্য রসিকতা ও শুচিবায়ুমুক্ত জীবন সম্ভোগে তাঁর ছিল অমিত উৎসাহ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "কার্মেন" অনুবাদ করার কারণ, তার বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চাইতে ঢের বেশী অসামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজম্‌কে আমি কোন কালেই একটা-গুণের মধ্যে গণ্য করি নি। তার পরিচয় আমার 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধেও পাবেন"। ( আত্মকথা )

"ফুলদানি" প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ এটির রুচি সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। প্রমথ চৌধুরী 'আত্মকথা'য় তার উল্লেখ করেছেন, এবং সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেছেন। বাংলা ছোটগল্পের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্য ও বিদেশী রুচির যোগসূত্র বলে এই দুটি অনূদিত গল্পকে আমরা গ্রহণ করি। এখানে বাংলা গল্পের মোড় ফেরাবার প্রাথমিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। কাব্যগুণসমৃদ্ধ গীতি-কবিতার সুরভিযুক্ত সমবেদনাস্নিগ্ধ 'ছোট প্রাণের ছোট ব্যথা নিয়ে গল্প রচনা ছাড়াও যে অন্যতর পথ আছে, তা এখানেই প্রথম জানা গেল। ফরাসী গল্পের জীবনদর্শন ও রবীন্দ্রনাথের তথা উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনা-লগ্নের বাংলা গল্পের জীবনদর্শন এক নয়। এ দুয়ের মধ্যে মিলনসাধনের প্রয়াস করলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি রোমান্স বা রোমাণ্টিক কাব্যানুভূতির ধার ধারতেন না।

"ফুলদানি"র ফুলের সৌরভে বহু বাঙালী লেখক আকৃষ্ট হলেন, ফরাসী গল্পের বহু অনুবাদ সেদিন 'সাহিত্য', 'ভারতী' ও 'সবুজপত্রে' দেখা গেল। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ননীমাধব চৌধুরী, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ফরাসী গল্পের বাংলা অনুবাদে দক্ষতার প্রমান দিলেন। ননীমাধব চৌধুরী অনূদিত 'মোপাসাঁ গল্প' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় প্রমথ চৌধুরী তার একটি ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি বলেন,

"মোপাসাঁ জগদ্বিখ্যাত গল্পলেখক। তাঁর গল্পের বিষয় নূতন, গল্প বলার ক্ষমতাও অসাধারণ। আর তাঁর ভাষা চমৎকার। আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন যে, He sold his Soul to the Devil for his pen। এর চাইতে স্টাইল সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা আর কিছু হতে পারে না।" এ ছাড়া বাংলা গল্পের একটি সংকলনে প্রমথ চৌধুরী মোপাসাঁর গুণগান করেছিলেন।

বাংলা গল্পের প্রথম পর্বে তাই দুই শ্রেষ্ঠ গল্পকার আদর্শ রূপে দেখা দিলেন—এক রবীন্দ্রনাথ, দুই মোপাসাঁ। দুজনের জীবন-দর্শনে ব্যবধান মেরু-প্রমাণ, তথাপি কোন একজনকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারি না। গল্পের আকাশে গীতিকাব্যের সুরভি ও তিক্ত জীবনালেখ্য —এ দুই-ই বাংলা গল্প পেয়েছে। এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য।

॥ ২ ॥

বাংলা গল্পের দ্বিতীয় যে পর্বের সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হল, তার ইঙ্গিত পেলাম কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের গল্পে। এঁদের আদর্শ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নন, বিদেশী গল্পলেখক—ফরাসী গল্পের মধ্যমণি মোপাসাঁ, রুশ গল্পের মধ্যমণি গোগোল, এবং স্কাণ্ডিনেভীয় গল্পলেখক-বৃন্দ। এঁদের পথ-নিয়ামক রবীন্দ্রনাথ নন, প্রমথ চৌধুরী। 'ভারতী' ও 'সবুজপত্র' অনুবাদ-গল্পের মাধ্যমে যে নতুন পথের সূচনা, 'কল্লোল,' 'কালিকলম,' 'প্রগতি,' 'উত্তরা', 'ধূপছায়া' পত্রে মৌলিক গল্পে তারই স্বীকৃতি। আধুনিক ভারতীয় ছোটগল্পের জনক ও মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথকে তিরিশের যুগের তরুণ বাঙালী গল্পলেখকেরা হয়তো বাহ্যত অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মাধ্যমে তাঁকে গ্রহণও করেছিলেন। বাস্তব জীবনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা রবীন্দ্র-গল্পে প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু মানব-প্রকৃতির কেবল সৌন্দর্য নয়, রহস্য-উদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। গত ষাট বছরে বাংলা ছোটগল্পের যে জগৎ নির্মিত হয়েছে ও ধীরে ধীরে

প্রসারিত হচ্ছে, সে জগতের ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথ। গল্পের ভাষা, প্রসাধননৈপুণ্য, পরিবেশ-স্থষ্টিকৌশল এবং মানব-জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি—এ সবই উত্তরাধিকার-সূত্রে আধুনিক বাঙ্গালী লেখক রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যে তিনজন গল্পকার আধুনিক গল্পের মহাজন, তাঁরা হলেন প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারি কথা' ও অন্যান্য গল্পে যে রোমান্টিকতা-বিরোধী সহাস্য বিদ্রূপে ব্যঙ্গে উজ্জ্বল জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর পাই, দুঃখের বিষয় তার অনুস্থতি হল না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনেকটা মোপাসাঁ অনুসারী ; তবে তিনি মোপাসাঁর মত নিষ্ঠুর 'cutter of life' ছিলেন না। প্রচুর কাণ্ডজ্ঞান, পরিহাস-দক্ষতা, জীবনের বিচিত্র অসংগতির ছবি আঁকতে তাঁর মত দক্ষতা খুব কম শিল্পীই দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু এঁদের প্রভাব স্থায়ী হতে পারল না, শরৎচন্দ্র এসে আচ্ছন্ন করে দিলেন। শরৎচন্দ্রের বাস্তববিশ্লেষণের পিছনে যতটা আবেগধর্মী অনুভূতি রয়েছে ততটা বস্তুনিষ্ঠা নেই। বাঙালী-জীবনের দুর্বলতম প্রদেশে তিনি আঘাত করলেন—হৃদয়ানুভূতির রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে তিনি গল্পরাজ্য তথা পাঠকের মনকে অধিকার করে নিলেন! অপরিসীম সহানুভূতি ও আবেগপ্রধান জীবনচিত্রণের মূলধন সম্বল করে বাংলা ছোটগল্পকে যে পথে চালিত করলেন তা প্রমথ-প্রভাতের পথ থেকে ভিন্ন। অশ্রুসজল মুহূর্ত, পারিবারিক জাবনের ছোট ছোট সংকট এবং আবেগ-প্রবণতার ফলে সে সংকট-মুক্তি—এর উপরই শরৎচন্দ্র নির্ভর করলেন। এবং আশ্চর্য, আকস্মিক দ্রুতবেগে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। 'মহেশ' একটি প্রথম শ্রেনীর গল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সেখানে পাঠকহৃদয়ের সহানুভূতি শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। রোমান্টিক উদাস-বিধুর মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার অশ্রুসজল ছবি এঁকেই

তিনি সাফল্য লাভ করলেন। মধ্যবিত্ত মানসের নির্মম বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ ছিল না, অস্তিত্বের জিজ্ঞাসার কৌতূহল ছিল না, রূঢ় বস্তুসত্যের চিত্রণে তিনি অগ্রসর হন নি।

কল্লোল গোষ্ঠির লেখকরাই স্কাণ্ডিনেভীয়, ফরাসী ও রুশ গল্পের প্রেরণায় বাংলা গল্পের আকাশে নতুন রঙ-রেখায় জীবনের নতুন চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) কল্লোল-পত্রিকার জন্ম-তারিখ। বাংলা ছোটগল্পে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মত এই বছরটিও তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল ভৌগোলিক পরিধির প্রসারে বিস্তৃতিতে নয়, অন্তর-মানসের সংকার্ণ সীমা লঙ্ঘন করে, অর্থনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যায় জীবনের নতুন ভাবে মূল্য নিরূপণে এঁরা উদ্যত হলেন। অবশ্যই রোমান্টিক নৈরাশ্যবোধ তিরিশের যুগের গল্পের প্রধান সম্বল। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী কেবল অর্থনৈতিক সংকট নয়, মানসিক সংকটের প্রবল আবর্তে পড়ে জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধের বিপর্যয়, সনাতন প্রত্যয়গুলির অপঘাত মৃত্যু, বুদ্ধিজীবির আশ্রয়চ্যুতি—সব মিলিয়েই একটা যুগান্তরের সূচনা করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলেই পরপর এই সব সংকট দেখা গেল। তিরিশের যুগের বাংলা ছোটগল্পে তার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিবর্তন যুগের কয়েকটি প্রতিশ্রুতি-উজ্জ্বল সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ নাম। রোমান্টিক নৈরাশ্যবোধ ও বোহেমিয়ান জীবনানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জীবনের তীব্র তিক্ত নির্মম আস্বাদন ও অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে ব্যক্তির নব মূল্যায়ন। ইউরোপের আকাশ বাংলা গল্পের আকাশে রঙ ফেলল, নোতুন মেঘে নোতুন সব ছবি দেখা গেল। মানবিকতা এই পর্বের গল্পের প্রধান কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে দেখা দিলেন সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ নোতুন গল্পকারবৃন্দ। এঁদের বাস্তবচেতনা আরও তীব্র হল, বিশ্লেষণ আরও গভীর হল, আবেগোচ্ছ্বাস কমে গিয়ে মননকর্মের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা গেল। মন্বন্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা, খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত —শতাব্দীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা এক দশকেই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে মথিত বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত করে দিল। ছোটগল্পে এই সব কিছুরই প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। বিপর্যস্ত বাঙালি-জীবনের প্রতিটি বিক্ষোভ-তরঙ্গের নিপুণ প্রতিচ্ছবি ছোট গল্পে পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে রচিত 'তিন সঙ্গী' গল্প-গ্রন্থটি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর-আন্তরিক পরিচয় বহন করে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে অর্থনীতি ও সমাজনীতির পরিবর্তমান পটভূমিতে যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার পরিচয়স্থল। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতের গল্পসাহিত্যে স্থান করে নিতে পেরেছেন। বাংলা গল্পকে বিশ্বের পটভূমিতে স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কীর্তির সঙ্গে এই কীর্তিও উল্লেখ্য; অন্যথায় গল্পকার রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না।

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকার গল্প-সাহিত্যে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারি নি। সাম্প্রতিক ইংরেজি গল্পে (বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে) যেমন সুস্থ সবল মানবিকচেতনা-উজ্জ্বল গল্পের ঘাটতি পড়েছে অসুস্থ উত্তেজক জীবনের আলেখ্য-অঙ্কনপ্রবণতা দেখা দিয়েছে, তার কারণ ওই পটভূমি এখনো আমাদের আলোচনায় বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। অথচ অতি-সম্প্রতি সুস্থ জীবনবিরোধী অসুস্থ উত্তেজক মুহূর্ত অবলম্বন করে

বাংলা গল্প লেখা হচ্ছে, তাও অবশ্যস্বীকার্য। আবার রাজনৈতিক উত্তেজনা ও শ্রেণীবিরোধের সূত্রমাফিক যে ধরনের সাম্প্রতিক গল্প রুশ ও ফরাসি ভাষায় দেখা যাচ্ছে, তাও যে সুস্থ জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি, এই বিবেচনা এখনও আমাদের মধ্যে কাজ করছে না, তার প্রমাণ এই শ্রেণীর গল্প বাংলায় রচিত হচ্ছে কিন্তু সার্থকতার পথসন্ধানে ব্যর্থ হচ্ছে। বাস্তবনিষ্ঠা কারুর কাছে কেবল অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপাদানরূপে মানুষের চিত্রণ বলে মনে হয়েছে, আবার কারুর কাছে জীবনের অসুস্থ উত্তেজক মুহূর্তের ক্লেদাক্ত আলেখ্য অঙ্কন বলে প্রতিভাত হয়েছে। আসল কথা এই যে, গভীর ব্যাপক জীবনবোধ, মানবিক মূল্যবোধের যথার্থ উপলব্ধি ও সামাজিক সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিক তুনিয়ার গল্পরাজ্যে সুলভ নয়। কোথাও এর আত্যন্তিক অভাব, কোথাও বা আংশিক রূপায়ণ। সম্প্রতি বাংলা গল্পে হয় এর সম্পূর্ণ অভাব, নয় আংশিক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। অপর দিকে দক্ষিণ আমেরিকার সাম্প্রতিক স্পেনীয় গল্পে ও ফরাসী গল্পের একটি অংশে অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল লেখক-মানসের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। আবার সাম্প্রতিক ইতালীয় ভাষায় রচিত গল্পে down-to-earth জীবনের যথার্থ প্রতিলিপি লক্ষ্য করি। এই তুটি ধারাও সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী' গল্পগ্রন্থে যে মহৎ সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে, সে পথে যোগ্য পদাতিকের সাক্ষাৎ পাই না।

তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে সাম্প্রতিক তুনিয়ায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ভাঙাগড়া চলেছে, জীবনের মূল্যবোধের যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে, তার সত্য চিত্র যতটা বাংলা গল্পে পাচ্ছি ততটা বাংলা উপন্যাসে পাই না। আধুনিকতার সার্থকতা সেখানেই যেখানে তা পরিবর্তমান সদাচঞ্চল বর্তমানের রূপটিকে সাহিত্যভাত করতে পারে। সেক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য সর্বথা সাফল্য অর্জন করতে

পারে নি। গভীরতা ছেড়ে বাংলা গল্প বৈচিত্র্যের দিকে ঝুঁকেছে। একালে ইউরোপ-আমেরিকার গল্পে বৈচিত্র্য যেমন আছে তেমনই গভীরতা আছে। গভীরতার অভাব সূচিত করে গভীর ব্যাপক জীবনবোধের অভাব। এই অভিযোগকে অস্বীকার করা কঠিন।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সুস্থ জীবনবোধের প্রতি যে অনুরাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা সাম্প্রতিক গল্পে সর্বথা-স্বীকৃত হয় নি। একালের কবির অন্বিষ্ট বাহিরে নয়, মনের গভীরে; তিনি গভীর সুরে বলেছেন—

'মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশা নয়, থাক পরম পাওয়ার এষণা।
চারা পোঁতাটাই নয়ক আসল সত্য,
আছে কিনা দেখ হৃদয়ের আনুগত্য।

[ 'সাগর থেকে ফেরা', প্রেমেন্দ্র মিত্র ]

মনের গভীরে পরম পাওয়ার এষণা একালের অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল পশ্চিমী গল্পে আমরা দেখেছি, কিন্তু বাংলা গল্পে তা এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিরল ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করে। সুস্থ গভীর জীবনবোধের অভাব সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে বৈচিত্র্যের অজস্র উপাদানে ও উত্তেজনায় মেটানো হচ্ছে। এ আর যাই হোক, প্রগতির লক্ষণ নয়।

আধুনিক গল্প যেখানে সার্থকতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সেখানে তা বাস্তব-সচেতন, জীবনবোধে উজ্জ্বল। গল্পের জন্য গল্প নয়, বৈচিত্র্যের অন্বেষণে গল্প নয়, যুগচেতনা ও বাস্তবচেতনার সত্য রূপায়ণের জন্যই গল্প—এই হল আধুনিক গল্পের আদর্শ। একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গের ছেদ টানছি। সম্প্রতি পার লাগেরকভিস্টের একটি গল্প-সংকলন 'The Marriage Feast and Other Stories' প্রকাশিত হয়েছে। বক্তব্যবিহান বৌচত্র্য-

সন্ধানী উত্তেজনা-প্রিয় গল্পে তাঁর আস্থা নেই। আধুনিক যুগের ব্যাধি সম্পর্কে তিনি সচেতন, বক্তব্যই তাঁর কাছে মুখ্য। তাই লাগেরকভিস্টের গল্প বক্তব্যপ্রধান, সরল, সংহত, ইংগিতময় ও রূপক-ধর্মী। গভীর মানবপ্রেম ও জীবনবোধের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর গল্পের আকাশ। এই সংকলনের একটি গল্পের নাম 'The Lift that went down into Hell'। গল্পটির সংক্ষেপসার শীলভদ্র-প্রণীত 'গ্রন্থবার্তা' থেকে এখানে তুলে দিচ্ছি।

ধনী ব্যবসায়ী মিস্টার স্মিথ শহরের সেরা হোটেলের ছাদের উপর একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে সন্ধ্যাটা ফুর্তিতে কাটাবে বলে। মেয়েটি স্বামীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। তারা-ভরা আকাশের নীচে দামী সুরার নেশায় চমৎকার কাটল সন্ধ্যাটা। রাতটাও একসঙ্গে কাটাবার সংকল্প করে তারা ছাদ থেকে নামবার জন্য লিফ্‌টে চড়ল। নিঃশব্দ নরম গতিতে লিফ্‌ট নামছে। লিফ্‌টের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে তাদের সান্নিধ্য নিবিড় হলো। যখনই তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে বা চুম্বন করছে, তখনই লেখক ধুয়ার মত 'the lift went down' কথা ব্যবহার করায় পাঠক এই ইঙ্গিত পাবে যে, শুধু লিফ্‌টই নামছে না, দুটি মানুষও নীচে নেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওদের খেয়াল হলো অনেক সময় পার হয়ে গেল, লিফ্‌ট তবু থামছে না। বাইরে ঘন অন্ধকার, তার মধ্য দিয়ে অবিরাম গতিতে লিফ্‌ট নামছে। লিফ্‌ট থামল এসে একেবারে নরকের দুয়ারে। শয়তান সেলাম করে অভ্যর্থনা জানাল। ওরা দুজন প্রথম তো ভয়ে হতবাক্‌ হয়ে পড়ল। কিন্তু শয়তান আশ্বাস দিয়ে বলল, নরক আজ-কাল আগের মতো নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে। এখন কাউকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় না। যাই হোক, আপনারা তো শুধু রাতটা থাকবার জন্যই এসেছেন। সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, কোনও অসুবিধা হবে না।

ওদের একটী আলাদা ঘর ঠিক করে দেওয়া হলো। অনেক দিনের নিষিদ্ধ আশা যখন পূর্ণ হতে চলেছে, তখন ওদের ঘরে একটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে প্রবেশ করল মদের গ্লাস হাতে নিয়ে। মেয়েটি চমকে উঠল। এ তো তার স্বামী! কপালে একটী গভীর ক্ষত। বুঝতে বাকি রইল না স্ত্রীর ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে তার স্বামী। মেয়েটি এই দৃশ্য সইতে পারল না, ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। শয়তান বলেছিল এখন নরকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় না, কিন্তু ভোগ করতে হয় মানসিক যন্ত্রণা। মেয়েটি সেই যন্ত্রণা ভোগ করছে; মানসিক যন্ত্রণাভোগ ও অনুশোচনার ফলে সে আবার উপরে উঠবার অধিকার পেল। এবার লিফ্‌ট তাদের নিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

বর্তমান সমাজের নীতিহীনতা ও শোচনীয় মানসিক অধঃপতনের এই সরল সংহত তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ ইঙ্গিতময় সমালোচনা পাঠকের মর্মকে বিদ্ধ করবে। এর অন্তরালে রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর দরদ আর ব্যাপক জীবনবোধ। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প একদিন এই উঁচুস্তরের শিল্পকর্মে পরিণত হবে—গল্পপাঠকের এই আশা। বোধ করি এ আশা দুরাশা নয়।

# বাংলার ছোট গল্প ঃ দ্বিতীয় প্রস্তাব

বাংলা ছোট গল্পের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হল প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী দশকে। এই পর্বটিকে আমাদের কালের পর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম পর্বের সূচনা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় পর্বের ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। প্রথম পর্বের অধিনেতা রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করলেন প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল )—এসব কথা পূর্বের প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে বাংলা গল্পের রূপান্তরসাধনের কৃতিত্ব কেবল কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-গোষ্ঠীর গল্পকারদের নয়, সেই সঙ্গে দাবিদার আছেন প্রবাসী-বিচিত্রা শনিবারের চিঠি বঙ্গশ্রী-ভারতবর্ষ-অলকা পত্রিকার লেখকরা। বস্তুতঃ তিরিশের দশকে বাংলা গল্পের আকাশে নব নব রঙের খেলা দেখতে হলে শেষোক্ত পত্রগোষ্ঠীর লেখকদের কাছে আমাদের যেতেই হয়। এখানে তাঁদের কথাই আলোচনা করব। বিশেষ করে প্রবাসী-বিচিত্রা-শনিবারের-চিঠি-বঙ্গশ্রী পত্রিকার সেই পর্বের সংখ্যাগুলি পড়লে এ সত্যই প্রতিভাত হয়, কল্লোলের সাতটি তারা-ই ( অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-শৈলজানন্দ-প্রবোধ-মণীশ-জগদীশ ) নয়, সেদিনের গল্পাকাশে আরও অনেক দ্যুতিময় তারার অভ্যুদয় হয়েছিল। তাঁদের মধ্য অবশ্য-স্মর্তব্য নাম হল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনবিহারী মুখোপাধায়, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, অশোক চট্টোপাধ্যায়,

সুধীরকুমার চৌধুরী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণীন্দ্রলাল বসু, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অমলা দেবী, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সম্বুদ্ধ, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও পরিমল গোস্বামী। এই দুই ডজন গল্পকার কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত নন, কিন্তু তিরিশের দশকে বাংলা গল্পে এঁদের বাদ দিলে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। অবশ্য কয়েকজনের সঙ্গে 'কল্লোলে'র অল্প-বিস্তর সম্পর্ক ছিল।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা সমরোত্তর যুগের দুনিয়া-জোড়া সংশয় নৈরাশ্য ও আশাভঙ্গের বেদনাকে গল্পে শিল্পরূপ দিয়েছেন। পশ্চিমী দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতির আলোকে তাঁরা সংসারকে নবরূপে দেখেছিলেন। জীবনের সনাতন প্রত্যয়গুলির অপঘাত মৃত্যু ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা স্কাণ্ডিনেভীয়, ফরাসি, রুশ ও ইংরেজী গল্পের দ্বারা প্রভাবিত হলেন ও বোহেমীয় জীবনের দিকে ঝুঁকলেন। সেই সঙ্গে নাগরিক জীবন ও নগর-নির্ভর মধ্যবিত্ত জীবনের তিক্ত নির্মম বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করলেন; আর সমাজের নীচুতলার শ্রমজীবী মানুষকে বন্দরে-খামারে-কয়লাখনিতে-কারখানায় আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কার ও নবমানবিকতার কৃতিত্ব তাঁদের অবশ্যপ্রাপ্য। কিন্তু এর মধ্যে নেতিবাচক দিকটি প্রবল হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম' জীবনের সমগ্র রূপদর্শনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

এই অভাববোধ পূরণ করলেন প্রবাসী-বিচিত্রা-শনিবারের চিঠি-বঙ্গশ্রী পত্রগোষ্ঠীর লেখকরা। পশ্চিমী জীবনের ছবি পাওয়া গেল অন্নদাশংকর রায় ও মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে; প্রকৃতির পরিবেশে মানুষের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ রূপটি দেখা গেল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর গল্পে; বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনের বিশ্লেষণ-চিত্র পাওয়া গেল মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ; গার্হস্থ্য-জীবনের মধুস্বাদী পরিবেশটি রূপ লাভ করল সীতা দেবী, শান্তা দেবী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও মনোজ বসুর গল্পে ; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে-হাসিতে সাধারণ জীবন অসাধারণ হয়ে উঠল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, সম্বুদ্ধ, সজনীকান্ত দাস, অমলা দেবী, প্রমথনাথ বিশী ও পরিমল গোস্বামীর গল্পে। আর রোমান্টিক প্রেমের চিত্রাঙ্কনে এঁরা প্রত্যেকেই কৃতিত্ব দেখালেন।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা তাঁদের গল্পে পূর্ব-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন ও এক নোতুন জীবনের আদর্শকে গল্পে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্যমান লেখকগোষ্ঠী তা করেন নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত যুগের গ্রামজীবনের সরলতা, ধর্মবিশ্বাস ও প্রকৃতিপ্রেমকে মূলধন করে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের ভেঙেপড়া জমিদারকুলের দুর্মদ প্রাণাবেগ ও স্বেচ্ছাচারিতার এবং সমাজের অন্তে-বাসী বেদে-সাঁওতাল জীবনের সরলতা ও অলৌকিক বিশ্বাসের ছবি আঁকলেন। মনোজ বসুর সেকালের গল্পগুলির পটভূমি দক্ষিণ-বঙ্গের জনপদ, চরিত্রগুলি এই ভূমিরই মানুষ—শহুরে জীবনের কৃত্রিমতা-মুক্ত। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর গল্প রাঢ়-বঙ্গের বৈষ্ণবদের ধর্মবিশ্বাসের পটভূমিতে রচিত। নদীমাতৃক বাংলার বিভিন্ন রূপ তাই তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মনোজ বসু ও সরোজকুমারের গল্পে ধরা পড়েছে।

॥ ২ ॥

কল্লোল-গোষ্ঠীর কাছাকাছি গিয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গল্পের সীমানাকে প্রসারিত করার অনেকটা কৃতিত্ব এঁরা দাবি করতে পারেন। মানিকের প্রতিষ্ঠা

অতি-সচেতন নির্মোহ বিজ্ঞান-বুদ্ধির উপরে, তারাশংকরের প্রতিষ্ঠা রাঢ়-বঙ্গের জনপদ-জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতায়।

"গল্প লেখার গল্পে" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'তখনও আমি বিশ্বাস করি নি, আজও বিশ্বাস করি না যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ আছে।' বিজ্ঞানের কঠিন নির্মোহ বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর কাছে আদৃত হয় নি। আমাদের পরিচিত সংসার, প্রেম, যৌনাবেগ, পারিবারিক সম্পর্ক তিনি বিজ্ঞানী বিশ্লেষণের আলোকে দেখেছেন ও তাই গল্পে রূপ দিয়েছেন। তা দেখে আমরা ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠি। জীবন-নাট্যের নিরাসক্ত অবিচলিত বিধাতা রূপে তিনি আমাদের আত্মদর্শন করিয়েছেন। যে নির্মম সত্য আমরা সহ্য করতে পারি না, অথচ অস্বীকার করতেও পারি না, মানিক তারই ভাষ্যকার। "আগন্তুক," "ফাঁসি," "প্রাগৈতিহাসিক," "সরীসৃপ," "নমুনা," "মুখে ভাত" এই নির্মম জীবনচিত্রণের পরিচয়স্থল। 'বিচিত্রা' ও 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়, "অতসী মামী" ও "সরীসৃপ"।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে জীবনকে গ্রহণ করেছেন "ভাল-মন্দ সকলি মিলায়ে"। রাঢ়-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সমাজের ওপর-তলা থেকে নীচু-তলা পর্যন্ত তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 'কল্লোল' ও 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর প্রথম গল্প যথাক্রমে "রসকলি" ও "শ্মশানঘাট" প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পে জীবনের পথ মানিকের গল্পের মত বক্রকুটিল গূঢ়চারী নয়, তা সরল ঋজু শরবৎ। জীবনের সহজ সরল বিকাশগুলির আবেগসমৃদ্ধ শিল্পরূপায়ণে তাঁর ঝোঁক। "জলসাঘর" গল্পে জমিদার-বংশের বৈভব ও পতন—দুই-ই তিনি দেখিয়েছেন। আবার "রসকলি" "জুয়াড়ী" "বেদেনী" গল্পে জনজীবনের বিচিত্র রূপ দেখেছেন। প্রবৃত্তি জীবনের মূল নিয়ন্ত্রক, প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের উত্থান পতন—এই বিশ্বাস তাঁর গল্পগুলিতে অনুস্যূত হয়ে আছে। আর "কামধেনু"র মত গল্পে

ভারত-জীবনের ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে।

'কল্লোলে'র সঙ্গে মানসিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন অন্নদাশংকর রায়, কিন্তু তিনি কখনও 'কল্লোলে' লেখেন নি, 'বিচিত্রা'য় তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। 'কল্লোলে'র তারুণ্য ও ইউরোপ-বন্দনা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু 'কল্লোলে'র নৈরাশ্য, যৌনবিলাস, বুদ্ধিজীবির মানস-সংকট তথা বিকৃতি ও অবাস্তব রোমান্টিসিজমকে অন্নদাশংকর গ্রহণ করেন নি। তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বিশুদ্ধ মনন ও ইয়োরোপের ধ্যান—বুদ্ধি ও মনীষার সঙ্গে হৃদয়াবেগের হরগৌরীর মিলন হয়েছে তাঁর গল্পে। সমস্যার রূপায়ণে নয়, মননপ্রধান সমালোচনায় তাঁর আগ্রহ। তাঁর অধিকাংশ গল্পের পিছনে একটি স্পষ্ট জীবন-দর্শন থাকে। গল্পের জন্য গল্প লিখতে তাঁর অনীহা। অন্নদাশংকরের "স্ত্রীর দিদি," "উপযাচিকা," "রূপদর্শন," "যৌবনজ্বালা" ও "রানীপসন্দ" গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

গল্পের জন্য গল্প নয়—জীবনের একটি গভীর প্রত্যয়জাত গল্প লেখায় অন্নদাশংকরের সঙ্গে আর যে কজনের নাম উল্লেখ্য তাঁদের অন্যতম হলেন ভবানী মুখোপাধায়। তিনিও 'কল্লোলে'র সঙ্গে অল্প-বিস্তর সম্পর্কিত। 'কল্লোলে' তাঁর একটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হয় 'পারুল' ( ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ )। ওই বছরেই 'ভারতবর্ষে' চারজন তরুণ লেখকের গল্প প্রথম প্রকাশিত হল, তাঁরা হলেন—প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য-কুমার ও ভবানী মুখোপাধ্যায়। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের গল্পটির নাম "মহাসাগরের নামহীন কূলে"। 'বিচিত্রা' ও 'অলকায়' তিনি বহু গল্প লিখেছেন। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত "দৃষ্টি" ( 'নির্জন গৃহকোণে' সংকলন-ভুক্ত ) ও 'অলকায়' প্রকাশিত "সাপ" ( 'সেই মেয়েটি' সংকলনভুক্ত ) গল্প দুটি খ্যাতি লাভ করেছিল। এই দুটি সংকলন ছাড়া তাঁর আরও তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—"যথাপূর্বং", "বনহরিণী", "চন্দ্রমল্লিকা"।

এই সংকলনগুলির গল্পে যে নিরাসক্ত জীবন-বিশ্লেষণ, মোহমুক্ত রূপ-অন্বেষণ ও মননশীল বিচারের দেখা মেলে তা প্রশংসার্হ। বাংলা গল্পকে বিশুদ্ধ গল্পরসে জারিত না করে মননের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে একালে যাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম ভবানী মুখোপাধ্যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রেমেন্দ্র, অন্নদাশংকর, মানিক, সুবোধ ঘোষ ও বনফুলের সহগামী। এঁদের গল্পে মননের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রভাতকুমারের গল্পে বাঙালি-জীবনের আনন্দময় কৈশোরের উচ্ছ্বাসপ্রবণ আবেগ ও সরলতার উজ্জ্বল ছবি পাই। তা আর কখনও ফিরে আসবে না। কেদারনাথের ও উপেন্দ্রনাথের গল্পে তার অনুস্মৃতি লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গল্পে এই আনন্দ-সম্মিত সুরের মায়াজাল রচিত হয়েছে। সৌন্দর্যতন্ময়তা, কাব্যময় পরিবেশ, গীতিকবিতার স্বাদ, কোমল অনুভূতির কোমলতর আলেখ্য 'গল্পগুচ্ছে' পাই। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের ছোটগল্প সম্পূর্ণ ভিন্নতর শিল্পকর্ম। দেখা দিয়েছে সমাজ-সমস্যা ও তজ্জনিত সঙ্কট, প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বিরোধ ও সংঘর্ষ, প্রশ্নসংকুলতা, উগ্র বাস্তবচেতনা। "তিনসঙ্গী" এর পরিচয়স্থল। বাংলা গল্পে যে পালা-বদল হচ্ছে তার ইঙ্গিত এখানেই পাওয়া গেল। শরৎচন্দ্রের ও 'ভারতী' গোষ্ঠীর গল্পের সমস্ত রোমান্টিক আবেদন ও ভাবাকুলতাকে ছাপিয়ে উঠল প্রমথ চৌধুরীর সংশয়ী কণ্ঠস্বর। "তিনসঙ্গী"র বহুতর সঙ্গীর দেখা পাওয়া গেল। এল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর গল্প—প্রশ্নসংকুলতা, সমস্যার জটিল রূপায়ণ, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, নির্মম কঠিন অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা প্রাধান্য পেল। আর এই প্রবণতাকে যাঁরা তীক্ষ্ণাগ্র করে তুললেন, তাঁরা হলেন আলোচ্যমান গল্পকারবৃন্দ—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, বনফুল, ভবানী মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর পর্বে আরও অনেকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন-সংকুল, বাদ-প্রতিবাদে উষ্ণ, বিপরীত মতবাদের ঝটিকাক্ষুব্ধ পরিবেশে

জীবনের অর্থ অন্বেষণ করলেন। বাংলা গল্পকে কাব্যপরিবেশ থেকে বাস্তবলোকে উত্তীর্ণ করার কৃতিত্বে এঁরাও অংশভাগী।

॥ ৩ ॥

আলোচ্যমান গল্পকারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অতিপ্রাকৃত রসের ব্যবহার। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকরা এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নি ; অচিন্ত্যকুমারের "ছায়া" গল্পটি ব্যতিক্রমরূপেই সমুপস্থিত। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, তারাশংকর, শরদিন্দু, বনফুল ও প্রমথ বিশী অতিপ্রাকৃত গল্পের সার্থক শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের হাতে অতিপ্রাকৃত রস যে রূপ লাভ করেছে তা একক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তা এই আলোচনার বাইরে।

অতিপ্রাকৃত রসের সৃজনে প্রয়োজন কল্পনার অবাধ বিস্তার ও কল্পরসের স্বেচ্ছাবিহার। উপরোক্ত গল্পকারবৃন্দ এই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এই শ্রেণীর গল্পে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মেঘমল্লার", "খুঁটিদেবতা," "বউচণ্ডীর মাঠ," "জলসত্র", "অভিশপ্ত", "হাসি," "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প" এর সার্থক পরিচয়স্থল। "মেঘমল্লার" গল্পের পটভূমিতেই এর সার্থকতার রহস্য নিহিত। বৌদ্ধযুগের তান্ত্রিক ও বৌদ্ধাচার্য, বৌদ্ধবিহার ও পালি ভাষায় শাস্ত্রালোচনার রহস্যময় বাতাবরণে বন্দিনী সরস্বতীর বেদনা রূপায়িত হয়েছে। অনৈসর্গিক ও অতীন্দ্রিয় রহস্যে বিভূতিভূষণের কেবল সাহিত্যবিশ্বাস নয়, গভীর জীবন-প্রত্যয় ছিল—তার চমৎকার পরিচয় পাই, "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পে"। রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যান ও অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে বিশ্বাস এখানে মিলিত হয়েছে কাব্যসুরভিময় বর্ণনার সঙ্গে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ডাইনী" গল্পটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। রুদ্র প্রকৃতির বর্ণনায় এখানে লেখকের আশ্চর্য সাফল্য

দেখা গেছে। ছাতিফাটা মাঠের রুক্ষ ভয়ঙ্কর তৃষার্ত বুকে জলরেখা মাত্র নেই, কেবল দগ্ধতৃণ ও সৌরদাহ। গ্রামজীবনের কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাস এই গল্পের মূলে আছে। অতিপ্রাকৃত রসের সার্থক উদাহরণ পাই মনোজ বসুর "বনমর্মর" ও "প্রেতিনী" গল্পে। "বনমর্মরে"র পরিবেশ কিংবদন্তীর দেশে, পটভূমি দক্ষিণ বাংলার গ্রামে অরণ্যাকীর্ণ ভগ্ন প্রাসাদ। রোমান্টিক প্রেমের অতীত কাহিনী বর্তমানের প্রতিনিধি শঙ্কর-ডেপুটির সামনে লেখক কাব্যকৌশলে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। শঙ্করের স্মৃতিপথে অতীতের প্রহরগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনেকটা 'ক্ষুধিত পাষাণে'র কৌশল লক্ষ্য করা যায়—চিত্ররূপে বর্ণালিম্পনে অতীত রোমান্সের জীবন্ত আলেখ্য "বনমর্মরে" অঙ্কিত হয়েছে। আর "প্রেতিনী" গল্পে অতি-পরিচিত পরিবেশের মাঝেই লেখক অতি-প্রাকৃত শিহরণ সঞ্চার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে" গল্পের মনস্তত্ত্ব-কৌশলটি মনোজ বসু স্বকীয় ভঙ্গীতে এখানে প্রয়োগ করেছেন। হরিচরণের মানসিক পাপবোধই মৃতা প্রথমা পত্নীর রূপ ধরে তার সামনে আবির্ভূত হয়েছে। অতি-প্রাকৃত পরিবেশ রচনায় কোনও বিশেষ আয়োজন করতে হয়নি। হরিচরণ যে মুহূর্তে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রভাকে বলছে, প্রথমা পত্নী সরযূ—"সে শুধু নামেই তোমার সতীন, ভালবাসার ভাগ পায় নি। ঠিক এমনি সময়ে মাঝি বলিয়া উঠিল—কলমিডাঙায় এলাম মাঠাকরুণ—। কশাড় হোগলাবনের মধ্যে ঢুকিয়া হোগলার আগা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নৌকা ডাঙায় আসিয়া লাগিল। হরিচরণের মুখের হাসি নিবিয়া গেল। তাহার কেমন মনে হইল, যাহাকে কোনদিন ভালবাসে নাই বলিতেছিল, সে যেন কথাটা আশপাশ কোনখান হইতে শুনিয়া ফেলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ ঠিক সরযূরই কান্না, সুরের তীব্রতায় যেন সহস্রগুণ জোরে আসিয়া বুকে লাগিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঘাটের উপরে বাঁশঝাড়, নীরন্ধ্র অন্ধকার—সেখানে কটর-কটর-কট সে যে কি শব্দ উঠিতেছে, যেন কে সমস্ত চিবাইয়া

ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলে আর কি। সেই অন্ধকারে কিছু দূরে বাঁওড়ের কিনারায় হরিচরণ অকস্মাৎ যেন সরযূকে দেখিতে পাইল। সরযূকে সে কতকাল চোখে দেখে নাই, মন হইতে সে যেন মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিল, তেমনি খুব ফরসা এবং কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা টকটক করিতেছে, পরনে লালপাড় শাড়ি, রঙ কাঁচা হলুদের ন্যায়—সে যে, তাহাতে কোন ভুল নাই।"

অতিপ্রাকৃত রসসৃজনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। শরদিন্দুর ভাষার এমন একটি জাদুকরী শক্তি আছে যা মুহূর্তেই বহু শতাব্দীর পারে আমাদের উত্তীর্ণ করে দেয়। রঙে রেখায় রোমাঞ্চকর পরিবেশ ও অতিপ্রাকৃত রসসৃজনে শরদিন্দুর নৈপুণ্য বারবার স্বীকার্য। 'চুয়াচন্দন' গল্প-সংকলনটি এর প্রমাণ। ভারতে পর্তুগীজ আক্রমণ, ভাস্কো-ডা-গামার দস্যুতা, নির্মম হত্যা, নির্মমতর প্রতিহিংসা, আরব-সমুদ্রের শিহরণময় পরিবেশ—সব কিছু মিলিয়ে "রক্তমেঘ" গল্পে এমন একটি uncanny বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যা কোলরিজের 'অ্যান্‌সেন্ট ম্যারিনার' কবিতার মধ্য-সমুদ্রের ভয়ঙ্কর পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৌদ্ধযুগ ও মুসলিমযুগের ভারতে শরদিন্দু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন জাদুকরের মোহ-দণ্ডটি হাতে নিয়ে। অতীত ইতিহাসে অতিপ্রাকৃত রস ও রোমান্স-সৃজনে শরদিন্দু দ্বিতীয়রহিত।

অতিপ্রাকৃত রসসৃজনে অবশ্য-স্মর্তব্য আর একটি নাম 'বনফুল'। বনফুলের গল্পে বিধাতার সৃষ্টির প্রাচুর্য, জীবনের অজস্র সহস্রবিধ বৈচিত্র্য-সমারোহ। বলতে ইচ্ছে করে 'Here is God's plenty'। তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত রসও একটি। 'লক্ষ্মীর আগমন' উপন্যাসে বনফুল অতিপ্রাকৃতকে উপস্থিত করেছেন জ্যোৎস্নারাত্রের মোহময় পরিবেশে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মানব-চরিত্রের উপর প্রতিক্রিয়ায়। অমর্ত্যলোকের রহস্যানুভূতির সার্থক শিল্প-রূপায়ণ বলে এই গ্রন্থকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। বনফুলের গল্পেও এই শক্তির

পরিচয় ছড়িয়ে আছে। "অধরা" ও "অবর্তমান" গল্প দুটি এর উদাহরণ। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে ক্রোশ দুই ভেঙে গেলে নির্জন বালির চর পাওয়া যায়। সেখানেই সারাদিন গল্প-কথক চখা-শিকারের চেষ্টা করেছেন। দিনান্তে এল সন্ধ্যা, এল সচন্দ্র-শর্বরী, চখা বার বার শিকারী-বক্তাকে প্রলুব্ধ করছে, কিছুতেই বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসছে না—কেবল তার 'কাঁআঁ' 'কাঁআঁ' ডাকটি শোনা যাচ্ছে। "অবর্তমান" গল্পটি জুড়ে এই রহস্যময় পরিবেশ বর্তমান; এই পরিবেশই গল্পের মুখ্য চরিত্র। বনফুলের কবিত্বশক্তি ও রহস্য-সৃজনক্ষমতার হরগৌরী মিলন হয়েছে উপরোক্ত উপন্যাসে ও এই গল্প দুটিতে।

অতিপ্রাকৃত রসের গল্প রচনায় অপর সার্থক শিল্পী প্রমথনাথ বিশী। সব্যসাচী প্রমথনাথের তুলিতে জীবনের নানা ছবি অঙ্কিত হয়েছে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ ও অতীন্দ্রিয় রহস্যসৃষ্টি তার একটি। 'অশরীরী' গল্পসঙ্কলনে প্রমথনাথের এই ক্ষমতার পরিচায়ক আটটি গল্প আছে। সব কটি গল্পেই অতীন্দ্রিয় পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত সচেতনতা বিশ্লেষণবুদ্ধি ও সংস্কারমুক্তি সত্ত্বেও আধুনিক মানুষের উপরে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তার মনস্তত্ত্বসম্মত শিল্পোত্তীর্ণ পরিচয় গল্পগুলিতে পাই। মানুষের নির্জ্ঞান মনের অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস-প্রবণতার কাছে আধুনিক কালোচিত যুক্তি ও বুদ্ধি কি ভাবে পরাজিত হচ্ছে তার চমৎকার পরিচয় এখানে পাই। 'চাপাটি ও পদ্ম' সংকলনে সিপাহী যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত গল্প আছে। সেখানেও এই অশরীরী অনুভূতির পরিচয় পাই—নানাসাহেব-চরিত্র সম্পর্কে জনশ্রুতির ভিত্তিতে একটি শিহরণকারী পরিবেশ লেখক সৃষ্টি করেছেন।

॥ ৪ ॥

গল্পরাজ্যে বিধাতার সৃষ্টির প্রাচুর্য যাঁর লেখায় পাই, তিনি 'বনফুল'। আঙ্গিক-নৈপুণ্যে, নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মানবচরিত্রের মূল্যায়নে, তীক্ষ্ণ মননশীলতায়, বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনায়, উদ্ভাবনী কৌশলে বনফুল অদ্বিতীয়। ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে শব-ব্যবচ্ছেদের যে ছুরি রয়েছে, তার নির্মম অথচ নিপুণ ব্যবহার হয়েছে মানবজীবনের বিশ্লেষণে। পরিচিত সংসারের পরিচিত মানুষের হীনতা-নীচতা তাঁর বিশ্লেষণের সূচীমুখে ধরা পড়েছে। বনফুলের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয় ব্যঙ্গকবিতায়—এ কথা মনে রাখতে হবে। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তাঁর কুণ্ঠাহীন আবির্ভাব। আজও সেই আগমনের দুঃসাহসিকতা বর্তমান। কেবল অতিপ্রাকৃত রসসৃজনে বা মানুষের নীচতা-হীনতার নির্মম বিশ্লেষণে নয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-দৃষ্টির সার্থক প্রয়োগ বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। লেখকের কৌতূহল যে কত ব্যাপক ও গভীর, সুদূর-প্রসারী ও সদা-অসন্তুষ্ট তার প্রমাণ গল্পে ছড়িয়ে আছে। বনফুলের ক্ষমতা কেবল 'to open out the soul of little and familiar things' নয়, সেই সঙ্গে ব্যঙ্গের দর্পণে আমাদের কর্মাবলীর নিপুণ প্রতিফলনেও নিযুক্ত হয়েছে। বনফুলের গল্পগুলি এত উপভোগ্য ও আকর্ষক যে দু-একটিকে বেছে নিয়ে উল্লেখ করা অসম্ভব।

একটিমাত্র গল্পের সংক্ষিপ্তসার এখানে দিচ্ছি। গল্পটির নাম "পারিবর্তন"। দাম্পত্য-জীবনের চরম ট্র্যাজেডির নিষ্ঠুর বর্ণনা এখানে পাই। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত স্বামী হরিমোহনের স্ত্রী সরমার পতিসেবা ত্রুটিহীন। কিন্তু সেবাযত্ন সত্ত্বেও হরিমোহন মৃত্যুর দিকে ধীর

নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সরমা যেদিন বুঝতে পারল হরিমোহনের জীবনের আশা কম, সেদিন সরমার এক অদ্ভুত আচরণ ডাক্তারের চোখে ধরা পড়ে গেল। সরমা গোপনে হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধ খেয়েছে। তার যুক্তি—যদি স্বামী না বাঁচেন, তবে তারই বা বেঁচে লাভ কি? এর ফলে সরমার দুটো লাংস্‌ই যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হল এবং তার মৃত্যু হল। এদিকে হরিমোহন কিন্তু মরল না। ধনী হরিমোহন সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে রোগমুক্ত হল। দেশে ফিরে সে আর একটি বিয়ে করল। অবশ্য পতিব্রতা সরমাকে সে ভুলে যায় নি—ততটা হৃদয়হীন হরিমোহন নয়। তাই বেছে বেছে সরমা নামধেয়া একটি মেয়েকেই সে বিবাহ করেছে।

পতিব্রতার জীবনদানের কী পুরস্কার!

এই সংক্ষিপ্তসার থেকেই বনফুলের মানবজীবন-চিত্রণ ও জীবন-দর্শনের পরিচয় পাই।

এ কালের বাংলা গল্পে শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পী 'বনফুল'। সেই সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী বলে মনে করতে হয় যাঁদের তাঁরা 'শনিবারের চিঠি'-'প্রবাসী'-'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার লেখকবর্গ—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস, সম্বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলা দেবী, ভবানী মুখোপাধ্যায়।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের "নরকের কীট", "শিবাজীর পেয়ালা", রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "হরিকুমারের বাণী", "চটক চাকী", "সোমেন সমাদ্দার" ('ত্রিলোচন কবিরাজ' ও 'দিবাকরী'র অন্তর্ভুক্ত), পরিমল গোস্বামীর "মারকে লেঙ্গে", "একটি রূপকথা", "অভিনন্দন", প্রমথ বিশীর 'ধনেপাতা' সংকলন, সজনীকান্ত দাসের 'কলিকাল' সংকলন, ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'যথাপূর্বং' সংকলন উল্লেখযোগ্য।

রাজশেখর বসু ওরফে 'পরশুরাম' স্বতন্ত্র লেখক, নিজেই একটি গোষ্ঠী এবং তাঁর গল্পগুলি অনন্যসাধারণ 'হিউমর'-আলোকে উদ্ভাসিত, তা আমাদের আলোচনার বাইরে।

॥ ৫ ॥

আলোচ্যমান লেখকদের গল্পের অন্যতম আকর্ষণ গার্হস্থ্যজীবনের আলেখ্য। বস্তুতঃ এইখানে সদ্য-অতীত গল্পের সঙ্গে এঁরা যোগ-সূত্রটি রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, কেদারনাথ, উপেন্দ্রনাথ বাঙালির ঘরের কথাকে শিল্পরসে পরিণত করেছিলেন। তারপর 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকেরা ইয়োরোপকে এবং নীচুতলার বাসিন্দা ও অপরিচিত জনজীবনের প্রতিনিধিকে গল্পের আসরে শিরোপা দিলেন, তাঁদের কাছে ঘরের মানুষ উপেক্ষিত ছিল। সেই উপেক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির গার্হস্থ্য-জীবনের আলেখ্য অঙ্কন করলেন আলোচ্যমান শিল্পীরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল সমাজচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার আলোকে মধ্যবিত্তের নীচতা-হীনতা আত্মপ্রতারণার নিষ্ঠুর ছবি আঁকলেন। আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, অমলা দেবী, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সীতা দেবী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ লেখকরা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের ছোট সুখ ছোট ব্যথার শিল্পরূপ দিলেন। দাম্পত্য রস ও বাৎসল্য রসের রূপকার হিসেবে দেখা দিলেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালির পারিবারিক জীবনের স্নেহমধুর সহানুভূতিশীল আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। "উমারাণী", "উপেক্ষিতা",

"মৌরীফুল", "কিন্নরদল", গল্পগুলি এক্ষেত্রে উদাহরণ-স্বরূপ উপস্থিত করা চলে। বিভূতি মুখোপাধ্যায় শিশুমনের কল্পনা-বিহার ও বাৎসল্য রসের চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। "রাণুর প্রথম ভাগ", "বাদল", "স্বয়ংবরা", "দাঁতের আলো" প্রভৃতি গল্প এর পরিচয়স্থল। আবার "মেঘদূত", "বিপন্ন", "বসন্তে" গল্প দাম্পত্যরসের ছবি। মনোজ বসু দাম্পত্যরসের আলেখ্যকাররূপে একদা খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। "রাত্রির রোমান্স", "ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা" তার প্রমাণ। আবার প্রেমের মধুর রোমান্সও তাঁর গল্পে লক্ষ্য করা যায়—যেমন, "পোস্টমাস্টার" ও "স্বয়ংবরা"; "শাস্তি" গল্পটি প্রেমের রোমান্স ও বাৎসল্যের স্নেহ—দুয়েরই পরিচয়স্থল। দাম্পত্যরসের গল্প সজনীকান্ত দাসের 'কলিকাল' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। তার মধ্যে "এক আনার ডাক-টিকিট" ও "পান্নালাল" অবশ্য-উল্লেখ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভল্লু সর্দার", ভবানী মুখোপাধ্যায়ের "বাতায়ন" শিশু-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ।

এই সকল গল্পে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যৌনবিকার বা যৌনাবেগের আকস্মিক প্রকাশ আবিষ্কার করা হয় নি; গল্পের পরিকল্পনা খুব অভিনব বা চমকপ্রদ নয়; ঘটনার আকস্মিকতাও অনুপস্থিত। তথাপি শিল্পকর্মরূপে এগুলির সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য। এর থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম সমরোত্তর কালের বাংলা গল্পে কেবল লালসার অসংযম বা দারিদ্র্যের আস্ফালনই বড় কথা নয়, আমাদের পরিচিত গার্হস্থ্যজীবনের মাঝেও যে শান্তির উৎস আছে তা সহানুভূতিশীল গল্পকারের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

॥ ৬ ॥

আলোচ্যমান গোষ্ঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্য গল্পে লক্ষ্য করা যায়—তা হল গল্পে ইয়োরোপের উপস্থিতি। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর

লেখকরা সচেতনভাবে ইয়োরোপকে বাংলা কথাসাহিত্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর পর এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব তাঁদেরই। স্কাণ্ডিনেভীয়, রুশ ও ইংরেজী গল্পের মধ্যে যৌবনের উল্লাস ও অ্যাডভেঞ্চারের যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তা-ই বিশেষ করে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ইয়োরোপের মননপ্রধান . ধ্যানের দিকটি, রোমান্টিক ভাবমুখ্য যৌবনের ছবিটি ধরা পড়ল আলোচ্যমান কয়েকজন লেখকের গল্পে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মণীন্দ্রলাল বসু ও অন্নদাশংকর রায়।

বাংলা গল্পে ইয়োরোপ প্রথম এল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থে। তারপর 'বীরবল'। প্রমথ চৌধুরী ইয়োরোপের পটভূমিতে বাঙালি তরুণের প্রেমাভিজ্ঞতা ও তার শোচনীয় ব্যঙ্গপ্রধান পরিণতি দেখিয়েছেন। তথাপি ইয়োরোপের তারুণ্য বাঙালি তরুণকে কি ভাবে প্রভাবিত করে, তার সুন্দর পরিচয় এখানে পাই। আর মণীন্দ্রলাল বসু ইয়োরোপকে রোমান্টিক অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখেছেন, ইয়োরোপের শিল্প-সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, তিনি তার ভক্ত। এই ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয়স্থল 'পদ্মরাগ'।

অন্নদাশংকর রায়ের গল্পে ইয়োরোপের যৌবন ভাবমূর্তিতে নয়, বাস্তবমূর্তিতে ও মননে ধরা দিল। 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণকথায় অন্নদাশংকর মন্তব্য করেছিলেন, "ইয়োরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভারকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মত ছোট করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।" 'আগুন নিয়ে খেলা' এই অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রথম বিশ্বসমরোত্তর ইয়োরোপের

রিক্ত-হৃতশ্বাস জীবনে প্রণয় কত ক্ষণস্থায়ী ও চটুল, তারই করুণ-মধুর আলেখ্য এটি।

অবশ্য ইদানীংকালে সৈয়দ মুজতবা আলী, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, রঞ্জন ও দেবেশ দাস ইয়োরোপের পটভূমিতে উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করেছেন, সে কথা বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত নয়।

# বাংলা ছোটগল্প ঃ তৃতীয় প্রস্তাব

"চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। চোখের নীচে তার কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখানা শির ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোটবোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক্‌লকে হয়ে উঠেছে। আমার কোন সান্ত্বনা, কোন উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ করে থাকতে দিল না। একসময়ে বললুম, শোভা, এটা ত জানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টিঁকে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক নিজেদের মান সম্ভ্রম বাঁচিয়ে—

মান-সম্ভ্রম?—শোভনা যেন আর্তনাদ করে উঠলো—কোথায় মান-সম্ভ্রম, ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক হয়ে গেলুম! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড়? কোন্ মিথ্যাবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল করে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাস টেনে বার করে, সেদিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না,

যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে চুষে খেলে তাদের কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো? যাও, খোঁজ নাও, ছোড়দা, ঘরে ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়ীতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জ্বলে-পুড়ে গেল দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা-পিসিমা-খুড়িমা-বোন-বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে জানো? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ? মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা?.........

কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি বলে যাও। তুমি বলে যাও কবে এই অপমানের শেষ হবে। আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?"

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল রচিত 'অঙ্গার' গল্পের নায়িকা শোভনার এই প্রশ্ন যুগান্তরের প্রশ্ন—বাংলা গল্পসাহিত্যের বেদনাদীর্ণ অন্তস্তল থেকে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে। ১৩৫০ সালের বাংলাদেশের হৃদয় থেকে এই প্রশ্ন উৎসারিত হয়েছে। ১৩৫০ থেকে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ—এই পাঁচ বৎসর বাংলাদেশ তথা ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনের সংকটলগ্ন। সেদিন মহাযুদ্ধ আর মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর মড়ক, কণ্ট্রোল আর কালোবাজার, দাঙ্গা আর দেশবিভাগ, ভ্রাতৃহত্যা আর নারীত্বের অপমান—এই নিয়ে জ্বলে-পুড়ে গিয়েছিল সোনার বাংলাদেশ। এই পাঁচ বৎসরের গল্পে তারই বেদনা ও জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়ে রচিত গল্পে সমাজ চেতনার সুরটি তীব্র হয়ে উঠেছে। মন্বন্তরপীড়িত যুদ্ধবিদ্ধস্ত ধর্ষিত বাংলার মর্মভেদী কান্না স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'অঙ্গার' গল্পের নায়িকা শোভনার বিলাপ সেই সমর্পিত ক্রন্দনের গল্পরূপ।

সেদিনের বাংলা গল্প ইতিহাসের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। বাঙালি গল্প লেখক সেদিন রোমান্টিক প্রেমের গল্প রচনার উৎসাহ পান নি, মুক্তির পূর্বলগ্নে দেশজোড়া বেদনাকেই ভাষারূপ দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত 'অঙ্গার' গল্পের সমাপ্তিতে লেখক বলেছেন, "শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হোলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙ্গালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে!"

কিন্তু না, এখানেই শেষ নয়, ক্ষুধার তাড়নার মধ্যে জীবনের আশা রয়েছে। শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর 'রক্তবীজ' গল্পটিতে [ 'কখনো আসে নি' গ্রন্থ ] যুদ্ধকালীন কলকাতায় মার্কিন সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের হৃদয়বিদারক আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু এখানে—এই সর্বব্যাপী নিরাশার মধ্যে আশার আলো জ্বলে উঠেছে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্য আর নারীত্বের শোচনীয় অপমানের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে নায়িকা নীলিমা। গল্পশেষে আশ্বাস পাই, নীলিমার একক সংগ্রামে আজ একে একে সবাই আসছে। বৃদ্ধ ডাক্তারের কথায় তারই উজ্জ্বল স্বীকৃতি ঃ "আমরা সবাই তোমার রুগ্ন স্বামীর জন্যে যুদ্ধ করব, আর তুমিও, শুধু তোমার স্বামীর জন্যে নয়, সকলের জন্যে যুদ্ধ করবে। সেবা দিয়ে সাহস দিয়ে আরো অনেককে সারিয়ে তুলবে তুমি।" 'অঙ্গার'-এর সর্বব্যাপী হতাশার পর এই ভরসা আমাদের আশ্বস্ত করে। কবির কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে ঃ

> এ কুৎসিৎ লীলা যবে হবে অবসান
> বীভৎস তাণ্ডবে

এ পাপ যুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম শয্যতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে,
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

১৩৫০-৫৪ সালের রচিত বাংলা গল্পে সেই কামান-গর্জন শোনা যায়।

মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের ভস্মশয্যা হতে উঠে আসবে মৃতুঞ্জয় প্রাণ—এই আশাই শেষপর্যন্ত লেখক ও পাঠককে উজ্জীবিত করে। এই সব গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় এযেন আর-এক বাংলাদেশ, তা কোনো পরিচিত সমাজ পরিবেশ নয়, এ এক প্রেতলোক, বাঙালি নামের অন্তরালে এক প্রেতসমাজ এর বাসিন্দা। এই জীবনচিত্রের পটভূমিরূপে বর্তমান মন্বন্তর-যুদ্ধ-দাঙ্গা-বিদ্ধস্ত বাংলা দেশ। এই প্রলয়ঝটিকায় আমাদের সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ, ভদ্র সংস্কার, মানমর্যাদা, জীবনবোধের সমস্ত রুচি-শালীনতা, পরিবার-জীবনের সমস্ত মাধুর্য নিঃশেষিত হয়েছে; গ্রাম ও শহরে, নগরে ও বন্দরে ক্ষুধা সম্বল প্রবৃত্তিসম্বল মানবকঙ্কাল উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বৌবাজারের মেসবাড়িতে একটিভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের অধঃপতনের চিত্র 'অঙ্গার' গল্পে পাই গল্পকথকের মুখে শুনি, "আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্য-কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের উপর দিগন্ত-জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন যেন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের

অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে বসে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা মাতৃরূপিণী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য-ফোটা ফুলের মত কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মত নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নটু, মীনু—এরা কি সেই তারা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ-নীতিভ্রষ্ট হোলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটলো এমন করে? কোন্ দয়াহীন দস্যুতা এর জন্য দায়ী?"

এই জ্বলন্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—দেশ কাল। মহাযুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-পীড়িত বাংলার সমাজজীবন ও নৈতিক জীবন—দুই-ই সেদিন অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। বাঙালি লেখকরা সেই পাতালপুরীতেই গল্পের উপাদান আহরণ করেছেন, বাস্তববিচ্যুত কোনো নিরঞ্জন সত্যের ব্যর্থ সন্ধান করেন নি।

॥ ২ ॥

কিন্তু মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে সেদিনের বাংলা গল্পে চরম বলে মেনে নেওয়া হয় নি। 'এরই মাঝে নিতে হবে পথ চিনে, দিতে হবে তরী পার'—এই প্রতিজ্ঞা গল্পকারের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। হয়েছে বলেই যে-মানুষ লড়ছে দুর্ভাগ্য আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সে-মানুষের দেখা পাই সেদিনের বাংলা গল্পে।

তার চমৎকার উদাহরণ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কেরাসিন'। রমজান চাষী—অতি দরিদ্র, কিন্তু তার সম্পদ তার বিবি হাস্যমুখী

হাস্তবিবি। বিবির অসুখ—ঘরে নেই এক বিন্দু কেরাসিন—চাইলে পায় না। সব কেরাসিন গেছে কালোবাজারে। পথ্য নেই, ঔষধ নেই, আলো নেই। রমজান আর পারে না। ভিক্ষায় হল না, এবার তবে স্পর্ধিত বিদ্রোহ। কেরাসিনের কালোবাজারী হাতেম শা'র গুড়ের আড়তে তাই রাতে আগুন লেগেছে। "গুড়ের হাঁড়ির মধ্যে লাল কেরাসিন। রমজান চলে এসেছে হাস্তের পাশটিতে। এবার দেখবে সে হাস্তকে। সে হাস্ত এখন ঘুমে, যার মুখ এখন অন্ধকার।"

'অঙ্গারে'র সর্বব্যাপী হতাশার পাশে 'কেরাসিনের' এই শুভ্র আলো জ্বলে উঠেছে। শ্রীসেনগুপ্তের অপর গল্প 'বস্ত্র' বিপরীত রসের অবতারণা করে। যুদ্ধকালীন বাংলা দেশের অপর অভাব —বস্ত্রাভাব নিয়েই এই গল্প। বস্ত্রের অভাবে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ বাইরে বেরুতে পারে না। সব বস্ত্রখণ্ড চলে গিয়েছে কালোবাজারের অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথে। লজ্জা নিবারণে অসমর্থ ছাদেম ফকির সদ্যপ্রাপ্ত কাপড় গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করল। পরদিন ছাদেমের স্ত্রী ও পুত্রবধূ ছাদেমের লাশ চালান দেবার আগে সেই কাপড় খুলে নিয়ে দুফালা করে পরেছে, তারপর কাঁদতে বসেছে। বস্ত্রসমস্যার কি নিষ্ঠুর সমাধান! শ্রীনবেন্দু ঘোষের 'বস্ত্রং দেহি' গল্পে বস্ত্রসংকটের ফলে নারীত্বের কী অসহায় অবমাননা ঘটতে পারে, তারই মর্মান্তিক আলেখ্য দেখি।

মহানগরীর রাজপথে দুর্ভিক্ষ-তাড়িত সহস্রজনের মধ্যে তিনজন—পার্বতী, তার স্বামী মানিক, তার শিশুকন্যা টুনু। কাজ নেই, অন্ন নেই, ভিক্ষা নেই। শেষে পেটের জ্বালায় পার্বতী দেহদানে বাধ্য হল, টাকা হাতে এল, কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। স্বামী-কন্যা অন্যলোকে যাত্রা করেছে। ভৈরবীর মত, পাগলিনীর মত

চিতাগ্নির মত ধর্ষিতা পার্বতী নারীত্বের মূল্য এক টাকার নোট ও কয়েক আনা পয়সা নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু মৃত স্বামী-কন্যার জন্য পার্বতী কাঁদে না। মুষ্টিবদ্ধ হাতে সেই অবমাননার কড়ি। “পার্বতী হাতের দিকে চাহিয়া ভাবে—অতীতের কথা নয়, ভবিষ্যতের। নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে সে যেন একটা বাঁকা তলোয়ার ধরিয়া আছে। দুই চক্ষু তাহার নির্বাণোন্মুখ চিতাগ্নির মত জ্বল-জ্বল করিতে থাকে। ( পার্বতী—ভয় নাই। সৈনিকেরা প্রস্তুত আছে। )”

শ্রীনবেন্দু ঘোষ রচিত উপরোক্ত ‘বাঁকা তলোয়ার’ গল্পে আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতি পাঠককে হতাশার অতল গহ্বর থেকে টেনে তোলে। আবার শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত রচিত ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’ গল্পে [ ‘কান্না-হাসির লগ্ন’ গ্রন্থ ] ‘ফ্যান দাও’ আর্তনাদে কলকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে—আমাদের সমাজ সভ্যতার ’পরে ব্যঙ্গের কশাঘাতে মোহভঙ্গ হয়। কালোবাজারী সমাজের অধঃপতনের প্রতি নির্মম ব্যঙ্গ শ্রীপরিমল গোস্বামী রচিত ‘রূপান্তর’ গল্প। রেভারেণ্ড কিং সাহেবের মতিগতির অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় আমরা হাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যাই। আমাদের নীচতা, অমানুষিকতা নিষ্ঠুরতার উলঙ্গ প্রকাশ এই নির্মম ব্যঙ্গ-গল্প ‘রূপান্তর’ [ ‘ব্ল্যাক-মার্কেট’ গ্রন্থ ]।

কিন্তু এর চেয়েও সাংঘাতিক দৃশ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। উপরোক্ত গল্পগুলির পটভূমি কলকাতা শহর—যেখানে পায়ের তলায় মড়া, কানের পাশে ‘ফ্যান দাও’ আর্তনাদ, মাথার ওপরে সাইরেনের ক্রন্দন। মানবিক মূল্যবোধের চরম পরাজয় চিত্রিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ‘নমুনা’ গল্পে। এমন নিপুণ হাতে এত নির্মম গল্প রচনার ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই। কালো-বাজারী কালাচাঁদ নারী-ব্যবসায়ও করে। এতে বেশ দু পয়সা হয়। পেটের জ্বালায় পিতা কন্যাকে, স্বামী পত্নীকে বিক্রি করে দেয় দু বস্তা

চালের বিনিময়ে। এই গল্পের আপাত-গাম্ভীর্য নির্মম ব্যঙ্গকে তীব্রতর করে তুলেছে। টাকার লোভের কাছে—নারীব্যবসায়ের প্রচণ্ড লোভের কাছে মানবিক আবেগ কখনো কখনো আত্মস্ফুরণের বৃথা চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত পাঁকে ডুবে যাচ্ছে—এই ছবিটি 'নমুনা' গল্পে বড় হয়ে উঠেছে। মেয়ে শৈলকে বেচে দেবার আগে পিতা কেশবের খুঁতখুঁতে ধর্মবোধকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা ও নারীব্যবসায়ী কালাচাঁদের শৈলকে নিজ ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণের অভিলাষ—দুই-ই অর্থলোভের কাছে পরাজিত হয়েছে। সবচেয়ে নিষ্ঠুর মন্তব্য করেছে কালাচাঁদের রক্ষিতা 'মন্দোদরী'—যখন সে পথের কাঁটা শৈলর ঘরে নোতুন মানুষ ঢুকিয়েছে তখন কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছে—'( গজেনের ) খেয়াল চেপেছে, ও আর বেশী টাকা কি ? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

কামার্ত পুরুষ গজেন ও তার সরবরাহকারী কালাচাঁদ-মন্দোদরী ও সেই সঙ্গে ধর্মভীরু লোভী কেশব—সকলের মধ্যে যে বিষ প্রবাহিত হয়েছে, তাতে সমাজদেহের পচন শুরু হয়েছে, এই মর্ম্মান্তিক ব্যঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ব্ল্যাক মার্কেট,' শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুবাণ,' শ্রীনবেন্দু ঘোষের 'বস্ত্রং দেহি' প্রভৃতি গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও কালোবাজারের দাপটে জর্জরিত জীবনের আলেখ্য পাই। মানুষের লজ্জাবোধ, রুচি, সম্ভ্রম, মর্যাদা, পরিবার-বন্ধন, স্নেহ-দায়িত্ব—সব একে একে ভেঙে পড়েছে—মানবতার অবমাননার এই সব আলেখ্য দেখে মনে হয় এ বুঝি বাংলাদেশের নয়, অচেনা প্রেতপুরীর আলেখ্য। কিন্তু, না, এ সত্য—নির্মম উলঙ্গ সত্য। এই সত্যের দায় চুকিয়ে দেবার সৎসাহস সেদিনের বাঙালি গল্পকার দেখিয়েছিলেন। শ্রীসমরেশ বসু-রচিত 'শেষ মেলায়' গল্পে দেখি [ 'তৃষ্ণা' গ্রন্থ ] মোহন-সুভদ্রার জীবনের স্বপ্ন কীভাবে মন্বন্তরের ঝাপ্‌টায় গুঁড়িয়ে গেল।

মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর কেবল কৃষক-ক্ষেতমজুর শ্রেণীর মানুষদের গ্রামের জীবন থেকে উৎখাত করে কলকাতার নিষ্ঠুর রাজপথে ঠেলে দেয় নি, সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও সর্বনাশ সাধন করেছে। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' ( সূচনায় উল্লিখিত ) তার জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু 'অঙ্গার' গল্পের মত নৈতিকতার চরম অধঃপতনে হয়ত সবাই উপনীত হয় নি। দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট ইতরতা, নীচতা ও লোভ কী ভাবে ভদ্র মধ্যবিত্তকে অধঃপতনের পথে টানছে, তার চমৎকার উদাহরণ পাই অন্যান্য গল্পে—যেমন. শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রর 'জ্বর,' শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'মুখবন্ধ,' শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রর 'অন্নপাপ', শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'গুহ এণ্ড পাল'। প্রাক্তন প্রণয়িনী বর্তমানে ধনীর পত্নীর সঙ্গে ষ্টীমারে অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হল দরিদ্র শিক্ষকের কিন্তু প্রাক্তনাকে দেখে এখন আর দরিদ্র শিক্ষকের মনে কোনো মোহ জাগে না—সুযোগ মত শর্মিষ্ঠার মানিব্যাগ থেকে এক তাড়া একশ' টাকার নোট সরিয়ে ফেলে সেখানে ভূতপূর্ব প্রণয়ী সংক্ষিপ্ত পত্র রেখে দেয়—"তোমার কাছে অনেক বড় পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম"—এর জন্য কোনো অনুতাপ হয় না [ 'জ্বর' ]; পূর্বে অবহেলিত বর্তমানে কালোবাজারের ধনী শিবু এলো গ্রামে—সবাই আজ তাকে সমীহ ও খোসামোদ করে, তার কৃপার জন্য লালায়িত হয়; শিবু তার প্রাক্তন অন্নদাতা লাহিড়ী-বাড়ির খুড়িমা ও তার মেয়ে লাবণ্যকে কলকাতা নিয়ে এলো—করুণা ও সাহায্যদানে তাদের অপমান করবে বলে—এবং যে-লাবণ্য গ্রামে তাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করত আজ সেই লাবণ্য তার অনুগ্রহের জন্য লালায়িত—শেষ পর্যন্ত শিবুর কাছে আত্মদান করল—আর পর মুহূর্তেই শিবু তাকে ভোগের শেষে উচ্ছিষ্টের মতো ত্যাগ করল [ 'মুখবন্ধ' ]; চালের কালোবাজারীতে প্রশান্ত লাল হয়ে উঠল—এদিকে প্রশান্তর স্ত্রী লক্ষ্মীর দুর্ভাবনা রুগ্ন সন্তানের জন্য—তার ধারণা প্রশান্তর পাপে সন্তানের রোগমুক্তি হয় না—কিন্তু প্রশান্ত

দেখাল সে ধারণা ভুল—টাকায় কী না হয়—নামজাদা ডাক্তারের দামী ওষুধ-পথ্যে সন্তানের দ্রুত রোগমুক্তি ঘটল—তবু লক্ষ্মীর মন সন্দেহ-দোলায় দোলে—সে ঠিক বোঝে না—কে ঠিক, সে, না, তার স্বামী [ 'অন্নপাপ' ] ; গোবর্ধন গুহ ও প্রদ্যোত পাল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭—এই কয় বৎসরে নানা জাল-জুয়াচুরি-কালোবাজারীর মধ্য দিয়ে বারো লাখ টাকা করল—দেশবাসীকে ঠকাল – অথচ দেশশুদ্ধ সবাই তাদের ধন্য ধন্য করল [ 'গুহ এণ্ড পাল' ]।

এই পাঁচটি গল্পের সংক্ষিপ্তসার থেকেই বুঝতে পারি মধ্যবিত্ত বাঙালির কি শোচনীয় মানসিক ও সামাজিক অধঃপতন ঘটেছে। এর জের আজো মেটেনি। মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগ, কালো-বাজারী ও ক্লেদাক্ত অর্থগৃধ্নুতার ফলে বাংলাদেশের এ কী রিক্ত চেহারা—উৎপীড়িত মানবতা কী গভীর লজ্জায় অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় অবমাননার অন্ন লেহন করেছে—কোথায় এই অভিশাপ থেকে মুক্তি? এই জিজ্ঞাসাই এই সব গল্পের ফলশ্রুতি।

কিন্তু, না, এই অসহ্য অবমাননার বিরুদ্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তার উদাহরণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'টিচার'।

রাজমাতা হাই-স্কুলের সেক্রেটারী রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার বনাম দরিদ্র শিক্ষকবৃন্দ—এই অসম সংগ্রামে একজন চাকুরির তোয়াক্কা না করেই রায়বাহাদুরকে নির্মম ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেছে। সে-ই এই গল্পের নায়ক দরিদ্র শিক্ষক গিরীন। দেশব্যাপী শিক্ষক-ধর্মঘটের প্রস্তুতির পটভূমিতে এই গল্প রচিত হয়েছে। গিরীন তার ছেলের অন্নপ্রাশনে রায়বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছে—বাড়িতে দারিদ্র্য ও অভাবের নগ্নরূপটি প্রতিপদে রায়বাহাদুরের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। গিরীনের "ঘরের যে অসীম দৈন্য ভিখারীর সকরুণ আবেদনের মত এতক্ষণ তাঁকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা

দাবীদারের শাসানির মত ফুলে উঠেছে।" রায়বাহাদুর পালাবার পথ পান না। আত্মম্ভরী ধনীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এই গল্পে এত তীব্র, তিক্ত অথচ সংযতরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে এই নির্মম অবস্থা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। এর পাশে শিক্ষকতার পবিত্র ব্রত ও মহান দায়িত্ব সম্পর্কিত বক্তৃতা নেহাৎ জোলো মনে হয়।

এই নির্মম চাপা ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে আরো দুটি গল্পে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' ও শ্রীপ্রভাতদেব সরকারের 'বিনিয়োগ' গল্পে। যুদ্ধ, বেকারীর ভয়, কালোবাজারেয় নিষ্পেষণ মানুষকে মনুষ্যত্বভ্রষ্ট করেছে, জীবনবোধের সমস্ত ভদ্রতা ও শালীনতা বিসর্জিত হয়েছে, বাঙালির পরিবার-বন্ধন ও যুগ-যুগান্তরের সংস্কার ও ধর্মবোধ বিনষ্ট হয়েছে এবং পেটের ক্ষুধা ও প্রবৃত্তি-সম্বল প্রেতদলের আবির্ভাব ঘটেছে।

'কানাকড়ি' গল্পে আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত পরিবারের অধঃপতনের নৈতিক দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ-শক্তির ক্ষয়ের আলেখ্যটি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে কি ভাবে মনুষ্যত্ব নেবে যাচ্ছে, তার পরিচয় এই গল্প। দরিদ্র সদ্য-চাকুরিহীন স্বামী স্ত্রীকে পরের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলার উপদেশ দেয় এবং স্ত্রী এই প্রয়াসের ব্যর্থতায় নিজ সৌন্দর্যের অভাবের জন্য আহত অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়; যে 'হাফ-গেরস্থ' স্বচ্ছল রমণীকে ঘৃণা করেছে, আজ মনে-মনে তাকেই উপাসনা করে। সন্তোষকুমার ঘোষ কোনো অতিরঞ্জন বা বীভৎসতা ছাড়াই এই অধঃপতনের ছবিটি এঁকেছেন।

আর 'বিনিয়োগ' গল্পটি আরো সাংঘাতিক। গল্পের নাম তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধের সময়ে কলকাতা শহরে পরিবার-জীবনের ভাঙনের ভয়াবহ আলেখ্য এই গল্প। ভাইয়ের অবিশ্বাস্য পদোন্নতির মূলে আছে ভগ্নাকে উপরিতন অফিসারের লালসায় ইন্ধনরূপে ব্যবহার। সমস্ত গল্পটির মধ্যে এক লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি, নিষ্প্রাণতা ও বিষণ্ণতার পরিবেশ রচিত হয়েছে।

ভগ্নীর বিবাহে ভ্রাতার অদ্ভুত অনুৎসাহ, ভগ্নীর সংসার-সুখের প্রতি নির্লিপ্ততা, বন্ধুর প্রতি ব্যবহারে ভাইয়ের ঔদাসীন্য ও ভগ্নীর সংগীতচর্চায় বিরক্তি—এই সব ছোট-ছোট ইঙ্গিতের মধ্য নিয়ে লেখক সেই অনিবার্য কুৎসিত সম্ভাবনার দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যান, 'বিনিয়োগ' কথার বিশেষ অর্থটি হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত পাঠকমনে আভাষিত হয়।

'কানাকড়ি' ও 'বিনিয়োগ' গল্পের সমাজ-সত্য ভয়ংকর, কিন্তু তা অনস্বীকার্য। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীপ্রভাতদেব সরকার এই ভয়ংকর সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন এবং পাঠক অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সমাজজীবনের এই অধঃপতনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের পালাবার পথ থাকে না। লেখকের মানস-তিক্ততা যে সমাজবোধ ও মানবতাবোধের ফল, তার অনুধাবনেই এই শ্রেণীর গল্পের সার্থকতা।

॥ ৩ ॥

আর এই সঙ্গেই পাই দাঙ্গার গল্প। ইতিহাস-বিধাতার নির্মম ইচ্ছায় ভারতরাষ্ট্র যেদিন দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হল, সেদিন ভারতের ইতিহাসের একটি গভীর লজ্জা, কলঙ্ক ও দুঃখের দিন। তার আগে শাসকের অদৃশ্য হাতের নিপুণ কূট চক্রান্তে ভারতের মানুষ প্রতিবেশীকে, ভাইকে, অপর সম্প্রদায়কে ভুল বুঝেছে, ঘৃণা করেছে, বিদ্বেষ পোষণ করেছে ও হত্যা করেছে। দাঙ্গার আগুনে মানবতা-বোধের জয় ও পরাজয়—দুই ছবিই পাওয়া যায়। একদিকে মানুষের শুভ বুদ্ধি, অপরদিকে ধর্মোন্মত্ততা ও জিঘাংসা—এ দুয়ের সংগ্রামে কখনো বা প্রথমটির জয়, কখনো বা দ্বিতীয়টির জয় হয়েছে।

ছয়টি গল্পের আলোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। শ্রীনবেন্দু ঘোষের 'ত্রাণকর্তা', শ্রীরমেশ সেনের 'সাদা ঘোড়া', শ্রীমনোজ বসুর

'হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা' [ 'দুঃখ-নিশার শেষে' গ্রন্থ ], শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'দারুণ দিনের এক ঝলক' [ 'কান্নাহাসির লগ্ন' গ্রন্থ ], এবং শ্রীরমাপদ চৌধুরীর 'করুণকন্যা' [ 'আপন প্রিয়' গ্রন্থ ] ও 'অঙ্গপালি' [ 'পিয়াপসন্দ' গ্রন্থ ]।

এপাড়ায় হিন্দুদের বাস, ওপাড়ায় মুসলিমদের বাস, মাঝে সীমান্তের প্রহরী অন্ত্যজ ডোমের দল। কি কৌশলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নেতা বোস সাহেব ডোমেদের সর্দার ঝগরুকে খাতির করে তার হাতে মদের টাকা গুঁজে দিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ পরাহত করালেন ও নিজেরা পালিয়ে বাঁচলেন, 'ত্রাণকর্তা' তারই পরিচয়স্থল। এই গল্পে ফল্গুধারার মত ব্যঙ্গ প্রবাহিত, ধনী ও মধ্যবিত্ত 'ভদ্দরলোগ' হিন্দুরা নিতান্ত প্রাণের দায়েই ডোমেদের ভাই বলে বুকে নিয়েছিল, বিপদ থেকে উদ্ধারের পরই তাদের প্রতি আর তাকিয়ে দেখল না। দাঙ্গার ভয়াবহতার সঙ্গে মিশেছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হৃদয়হীনতা।

গল্পের শেষে লেখকের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-মন্তব্য এই হৃদয়হীনতাকে অনাবৃত করেছে।

"ওঁদের ( বোস সাহেবের ) গাড়ী দূরে মিলিয়ে গেল।

তখন ডোমপাড়ায় মহাভারতের নারীপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহু, বহু নারী হারিয়েছে তাদের বাপ, ভাই, ও স্বামী ও পুত্রদের। আগুনের শিখার মত কাঁপতে কাঁপতে একটা বিলাপের ধ্বনি আকাশের দিকে উঠছে। সুরতিয়াও কাঁদছে। ঝগরু মারা গেছে।

হ্যাঁ, ঝগরু মারা গেছে। কারণ মিঃ বোসদের বাঁচাবার জন্যই তো ঝগরুর মতো মানুষেরা চিরকাল জন্মায় আর মরে। পঞ্চ নিষাদ প্রাণ না দিলে তো রাজপুত্র পাণ্ডবেরা বাঁচতে পারত না।"

গল্প-সমাপ্তিমুহূর্তে লেখক শ্রীনবেন্দু ঘোষের এই মন্তব্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হৃদয়হীনতাকে উদ্ঘাটিত করেছে।

শ্রীরমেশ সেনের 'সাদা ঘোড়া' গল্পের নায়ক একটা পলাতক সাদা ঘোড়া। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন রক্তস্নানের পর সাময়িকভাবে শান্ত কলকাতার এক হিন্দু-পাড়ায় এক সাদা ঘোড়া অন্যপাড়া থেকে এসেছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই সাদা ঘোড়াকে নিয়ে উন্মত্ত। হানাহানির মাঝে 'সোরাব' ওরফে 'চাঁদ' নামের এই সাদা ঘোড়ার জন্য মুক্তির প্রতীক। কিন্তু না, এরও পরিত্রাণ নেই। দাঙ্গার উন্মত্ততায় সাদা ঘোড়া প্রাণ দেয়—কালো পিচের পথে তার রক্তাক্ত মৃত দেহ পড়ে আছে। মানুষের জিঘাংসা এই শান্ত প্রাণীটিকেও রেহাই দেয় নি। এই ধিক্কার ও বিষণ্ণতার সুরে গল্পের সমাপ্তি।

আর শ্রীমনোজ বসুর 'হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা' গল্পের অকুস্থল পূর্ববাংলার এক গ্রাম। জেল-ফেরত কংগ্রেস কর্মী বিপিন গ্রামে এসে দেখে গ্রামের চেহারা বদলে গেছে। আজ জননীর দুই সন্তান—হিন্দু মুসলিম পরস্পরের শত্রু। বিপিনের চোখে লেখক শত্রুনিধানে প্রস্তুত হিন্দুগ্রামের ছবি এঁকেছেন—ডিফেন্স-পার্টির নামে খুনীর দল গ্রামে রাজত্ব করছে—নিজের বাড়ির ছাত থেকে মারা ইঁটের ঘায়ে বিপিনের মাথা ফাটল—সে ইট মেরেছে বিপিনেরই ছেলে সুকুমার। তবু আহত বিপিনের আশা আছে—এই রাত একদিন কেটে যাবে—সকালের আর দেরী নেই। "হ্যাঁ, পূবে ফরসা দিচ্ছে, সূর্য উঠছে, মানুষ মানুষকে চিনবে, ঐসব পোড়া ঘর-বাড়ির ছাইয়ের গাদায় ফুল ফুটে উঠবে।"

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত রচিত 'দারুণ দিনের এক ঝলক' সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের গল্প। দাঙ্গার ফলে বহু হিন্দু নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হয়। কিন্তু তারা যখন ফিরে আসে তখন আর হিন্দুসমাজ ও তাদের আত্মীয়স্বজন তাকে ঘরে নিতে চায় না, নিলেও মনের মধ্যে নেয় না। এই সংকীর্ণচেতা অনুদার নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজের প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছে গল্পের নায়িকা 'হাসিনা জামান' ওরফে 'সেদিনের প্রমীলা বসু'।

বান্ধবী জয়ন্তীর কাছে পত্রাকারে হাসিনা জামান তার ধর্মান্তরের কাহিনী জানিয়েছে—বিস্তারিত বলেছে কেন সে বাধ্য হয়েছে।

প্রমীলাকে হাসিনা হতে বাধ্য করেছে তারই সমাজ—হিন্দুসমাজ। প্রমীলাকে দাঙ্গার দারুণ দিনে তার মা-বাবা-ভাই ফেলে পালিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে পাড়ার ধর্মভীরু বৃদ্ধ মুসলমান কাদের সাহেব। তিনি রক্ষা করেছেন তার নারীত্বের সম্মান, তার জন্য জখম হয়েছে কাদের সাহেব ও তার পুত্র। এদের ছেড়ে অনিশ্চিত আশ্রয় মামার বাড়িতে প্রমীলা যেতে পারল না। আদালতে প্রমীলার বাবা-ভাই মিথ্যা জানালেন, তারা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কাদের সাহেবের ছেলে জামান তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই মিথ্যার প্রতিবাদে প্রমীলা জানাল, সে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে মুসলমানের পত্নীত্ব নিয়েছে। ভূতপূর্ব প্রমীলা সম্পর্কে সকল কুৎসার মূল এখানে।

এখানে প্রমীলা ওরফে হাসিনা জামান হার স্বীকার করে নি, হৃদয়হীন ভীরু সমাজের অনুগ্রহের আশায় না থেকে বিদ্রোহ করেছে, আপন মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। হাসিনা জামানের এই অকুণ্ঠ সত্যভাষণ হিন্দুসমাজের উপর নিষ্ঠুর চাবুকের মত এসে পড়েছে।

কিন্তু শ্রীরমাপদ চৌধুরীর 'করুণকন্যা' গল্পের ফলশ্রুতি এর বিপরীত। পূর্ব বাংলার গ্রাম থেকে যে রাতে তারা পালিয়ে আসছিল, সে রাতের কথা আজো মনে পড়ে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অরুন্ধতী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হয়, বাধ্য হয় ধর্ষকের পত্নীরূপে তার সংসার করতে, বাধ্য হয় তার সন্তানের জন্ম দিতে। আর যেদিন পুলিশের সহায়তায় অরুন্ধতী তার মায়ের কাছে ছেলে কোলে ফিরে এলো, সেদিন হিন্দুসমাজ তাকে সাদরে বরণ করে নিলো না, অরুন্ধতীর জন্য অপেক্ষা করে আছে বিদ্রূপ আর উপহাস।

প্রতিবেশিনীদের কপটতম হৃদ্যতা :

: শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে এসেছে বুঝি?

ঃ দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো।

ঃ ও মা, তাই নাকি? যাক্, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন, এই খুব।

শুধু কি তাই! প্রণয়ী সুবিমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেখানেও আশাভঙ্গ হল। সুবিমলের ভগ্নী মাধুরী অপহৃতা হয়েছিলো, তাকে ফিরে পাওয়াতেই সুবিমলের লজ্জা—খারাপ হয়ে গেছে মাধু!

তবে আর কি! এই নিষ্ঠুর পরিচিত সমাজে কোথাও অরুন্ধতীর ঠাঁই নেই। এমন সময় এলো তার চিঠি। সেই অন্ধকার কালো রাতের মানুষ। সে অরুন্ধতীকে ফিরে চেয়েছে, অন্ততপক্ষে তার শিশুকে—তা যদি না পারে তবে যেন একবার তাকে দেখতে দেয়।

কি করবে অরুন্ধতী? প্রতিবেশিনীরা নিষ্ঠুর, প্রণয়ী নীতি-বাগীশ, অশুচি বাঁচিয়ে চলে, মা বোঝে না। কিন্তু 'তার' সঙ্গে সুবিমলের তফাৎ কি? একজন শুধুই ঘৃণা পেয়েছে অরুন্ধতীর, আর একজন অজান্তে অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে। সব ইতিহাস জানা হলে সুবিমলও তাকে ছেড়ে যাবে। তবে কোথায় পথ? হ্যাঁ, সে ফিরেই যাবে—তার কাছে যে তাকে স্ত্রীর সম্মান ও জননীর মর্যাদায় ফিরে পেতে চায়।

অন্ধকার রাতে প্রতীক্ষিত লগ্নে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো অরুন্ধতীর—যে একদিন তার সবনিয়েছিলো, আজ সব দিয়ে তাকে ফিরে পেতে চায়।

"—চলো।

—ফিরে যাবে অরুন্ধতী?...সে বল্‌ল—জানতাম অরুন্ধতী তুমি ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে! বিদ্রূপের হাসি দুল্‌লো অরুন্ধতীর চোখে। সে তো ফিরে যেতে চায় নি, সমস্ত পৃথিবীই যে ফিরে চলেছে। পিছনের পথে তাকে, সব মানুষকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।"

বিদ্রূপে, কারুণ্যে, সমবেদনায়, নির্মম উদ্‌ঘাটনে 'করুণকন্যা' একটি অসাধারণ গল্প। দাঙ্গায় লাঞ্ছিত আধুনিকা দ্রৌপদীদের জীবন বেদনার এক মহান গল্পরূপ। কত সমাজসচেতন, কত নিপুণ বিশ্লেষক, কত কুশলী শিল্পী হলে এই ধরণের গল্প রচনা করা যায়, তা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন।

ধর্ষিতা আধুনিক দ্রৌপদীর জীবনের ট্রাজেডি শ্রীচৌধুরীর অপর গল্প 'অঙ্গপালি'তে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অপহৃতা সবিতা মাস আষ্টেকের একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল দেড় বছর পরে। কিন্তু নিজের পরিবারে আজ সে বাইরের লোক, অপরিচিতা, ঘৃণা ও কৌতূহলের পাত্রী। এই গল্পে সবিতার মায়ের কথায় এই নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মা বলছেন: "কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু।" সবিতার সকল স্বপ্নকে ভেঙে দিল এই নির্মম মন্তব্য।

এরপর অরুন্ধতী ও সবিতার মতো হিন্দু মেয়েদের জীবনে আর ভরসা করার রইল কি?

আর এই সব গল্পপাঠে আমরা মনে মনে গর্ব বোধ করতে পারি যে জাতির জীবনে নিদারুণ দুঃখরাতে আমাদের গল্পকারেরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে ছিলেন, তাঁদের লেখনীর অবমাননা করেন নি, তাকে বিদ্রূপের ও প্রতিরোধের বাঁকা তলোয়ারে পরিণত করেছেন। মন্বন্তর আর মহাযুদ্ধ, কালোবাজার আর কন্ট্রোল, নারীমেধ ব্যবসায় আর দাঙ্গা—এ সবের মধ্য দিয়ে বাঙালি লেখক সেদিন নির্ভীক পদক্ষেপে চলেছিলেন। সেদিন রোমান্সের স্বর্গ রচনায় তাঁরা উৎসাহ পান নি, ধূলার ধরণীর নরকের মধ্যে নিরঞ্জন সত্যের অন্বেষণ করেন নি, বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন এবং অকম্পিত লেখনীতে তারি আলেখ্য অংকন করেছেন। এই সত্যনিষ্ঠার অপর নাম জীবননিষ্ঠা, গল্পকারের কাছে এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নেই। সুখের

কথা, যুগান্তরের পর্বে বাঙালি গল্প লেখকেরা সে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

[ এই প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখ ছাড়া বাকি সব গল্প 'বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা'—উত্তর ভাগ, প্রথম পর্ব এবং ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩ ও ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের 'সেরা গল্প' সংকলন-পঞ্চক থেকে গৃহীত হয়েছে। ]

# বাংলা গল্প ও বিদেশিগল্প

বাংলা ছোট গল্পের লালন-পালনের দায়িত্ব গত শতাব্দীর শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ফলে বাংলা গল্প একেবারেই পৌগণ্ড থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইতিহাস-বিচারে হয়ত তাঁর পূর্ববর্তী দু চারজন আছেন, কিন্তু সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক বাংলা ছোট গল্পের যথার্থ স্রষ্টা বলা যায় এবং অদ্যাবধি তিনিই শ্রেষ্ঠ গল্পরচয়িতা। এ কেবল পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গের পটভূমিতে আজ থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে রচিত 'গল্পগুচ্ছে'র অতুলনীয় গল্পসমূহের জন্য নয়, অন্য কারণেও এ' সত্য স্বীকার্য। শেষ জীবনে রচিত "তিন সঙ্গী" গল্পসংকলনের গল্প তিনটি ও খসড়া আকারে রচিত 'প্রগতি সংহার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথকে এ'কালের গল্পসাহিত্যে পুরোভাগ স্থাপন করেছে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের উপস্থাপন, চরিত্র-উদ্‌ভাবনা, ঘটনা-বিশ্লেষণ এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পিছনে একটি বিজ্ঞানী, মননশীল, গূঢ় জীবনরহস্যভেদকারী স্রষ্টা মনের পরিচয় পাই। বস্তুত, এই পর্যায়ের গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও 'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্রনাথ-এ দুজনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতের শিল্পী বলে মনে হয়। 'তিন সঙ্গী' গল্পগ্রন্থে ১৯৩৯।৪০ সালের আধুনিক পৃথিবীর চিন্তা, ভাবনা, সংশয় ও গূঢ় জীবনজিজ্ঞাসার ছাপ পড়েছে এবং তার ভাষ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ও চরিত্র-সৃষ্টিতে (সোহিনী) যে চূড়ান্ত আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা এর আগে কখনও পাওয়া যায় নি। সোহিনীর মত নারীচরিত্র এর আগে সুবিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও দেখা যায় নি। সোহিনী intellectual চরিত্র; নারী সম্পর্কে গল্পকারের একটি তত্ত্বের প্রতিরূপ সে; অথচ কী তার দীপ্তি,

কী ঔজ্জ্বল্য, কী স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য! মননপ্রধান তত্ত্বসমৃদ্ধ গল্পরচনাতেও তাই রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী শিল্পী। অবশ্য গত শতাব্দীর শেষ দশকে ও বর্তমান শতকের প্রথম দশকে রচিত গল্পে সমকালীন সামাজিক সমস্যার রূপায়ন আছে, তাও স্বীকার্য। তার প্রমাণ—'স্ত্রীর পত্র', 'বিচারক', 'দেনা পাওনা', 'মেঘ ও রৌদ্র' 'ত্যাগ', 'শাস্তি' ( গল্পগুচ্ছ )। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বাংশে আধুনিক। প্রথম বিশ্বসমরের কালে রচিত এই গল্পে যে বিদ্রোহের সুর, নারীজাগরণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে অভিযান, সমাজ-প্রথাবিরোধিতার যে স্পর্ধা লক্ষ্য করা যায়, তা 'সবুজপত্র', 'ঘরে বাইরে', ও প্রমথ চৌধুরীর বিদ্রোহের যোগ্য ভূমিকা রচনা করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মারফতে কি রবীন্দ্রনাথ মোপাসাঁ পড়েছিলেন ?—এ প্রশ্নটি ভেবে দেখার মত।

বাংলা গল্পের সঙ্গে বিদেশি গল্পের পরিচয় করিয়ে দেবার কৃতিত্ব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নয়, তা প্রমথ চৌধুরীর। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ শিল্পীর পক্ষে কারুর অনুবাদ বা অনুসরণে প্রতিভা নিয়োগ করা সম্ভবপর নয়। বাংলা ছোট গল্প যখন রবীন্দ্রনাথের মহৎ সংস্পর্শে আসে নি, সেই সময় অর্থাৎ ১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে আখ্যানপ্রধান বা ঘটনামূলক গল্প খুব প্রচলিত ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ধারার শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

প্রমথ চৌধুরীই প্রথম ব্যক্তি যিনি এর বিরুদ্ধে গেলেন, প্রতিবাদ করলেন, বোঝালেন, বিদেশী গল্প, বিশেষভাবে ফরাসি গল্পের সংস্পর্শে না এলে বাংলা গল্পের অগ্রগতি হবে না। ফরাসি সাহিত্যের উদার জীবনসম্ভোগনীতি ও ব্যাপক কৌতূহল বাংলা গল্পের সংসারে আনতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য দুটি ফরাসি গল্প অনুবাদ করেন বাংলায়। প্রস্‌পার মেরিমির 'ফুলদানি'র বঙ্গানুবাদ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশ করেন ১২৯৮ বঙ্গাব্দে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। আরো একটি গল্প 'কারমেন'-এর বঙ্গানুবাদ তিনি করেছিলেন। এ দুটি গল্পই

সেদিনের বাঙালিজীবনের নীতিবোধকে আঘাত করেছিল। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, তাঁর কোনো শুচিবায়ু নেই, এবং তিনি সাহিত্যে সুনীতির দুর্নীতির বিচারে আগ্রহী নন। ঐ সময় প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্তে ও প্রেরণায় 'ভারতী', 'সাহিত্য', ও পরে 'সবুজপত্রে' বহু ফরাসি গল্পের বঙ্গানুবাদ হয়। বরদা গুপ্ত, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

'ভারতী' গোষ্ঠীর সব লেখকই অল্প বিস্তর ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করতেন। কবিতা অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কান্তিচন্দ্র ঘোষ যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তেমনি গল্পের অনুবাদে সদ্যোক্ত লেখকরা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ১৯১৪-১৮ঃ প্রথম বিশ্বসমর পর্বেই বাংলা গল্পরাজ্যে তাই ধীরে ধীরে ফরাসি গল্পের অনুপ্রবেশ ঘটল। কেবল 'ভারতী' নয়, 'সবুজপত্র' ও 'মর্মবাণী'—পত্রিকা দুটি এর ধাত্রী হলো। মেরিমি, মোপাসাঁ ছাড়াও গতিয়ে, য়্যুগো, বালজাক্ দোদে, দ্যুমার বহু গল্প ও উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করলেন 'ভারতী' গোষ্ঠী। এই পর্বের প্রধান গল্পলেখক হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ফরাসি গল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। মোপাসাঁর কলানৈপুণ্য হয়ত তাঁর ছিল না, কিন্তু জীবনকে দেখার ভঙ্গিটি ও গল্প-উপস্থাপনার কৌশলটি প্রভাতকুমার মোপাসাঁর কাছ থেকেই নিয়েছিলেন। তবে মোপাসাঁর গল্পে যে তিক্ততা ও নির্মমতা অনুভব করা যায়, তা প্রভাতকুমারের ছিল না; তিনি জীবনের অগভীর স্তরে লঘু কৌতুকের রাজ্যে অবাধে বিচরণ করেছেন। মোপাসাঁর মতই তাঁর ছিল সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা শ্রেণীর নানা চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই গুণ প্রমথ চৌধুরীরও ছিল।

এরপর যাঁর নাম অবশ্যউল্লেখ্য, তিনি হলেন জগদীশ গুপ্ত। বাংলা গল্পে তিনি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা বাংলা গল্পের পরিচিত

পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও 'মর্বিডিটি' প্রবর্তনে জগদীশ গুপ্তের কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। জগদীশ গুপ্ত য়ুরোপীয় জীবন-চিন্তার অংশভাক্ ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বের মাপকাঠিতে মানুষকে বিচারের যে আধুনিক য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সেটি তাঁর ছিল। অর্থনীতির বিচারে মানুষের অকিঞ্চিৎকরতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিচারের ভয়াবহ নির্মমতা ঃ এ দুয়ের সার্থক প্রতিরূপ জগদীশ গুপ্তের গল্পেই লক্ষ্য করা গেল। ফরাসি গল্পের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল কিনা, তা এখানে ভেবে দেখা যেতে পারে।

তারপরই এলো বহুখ্যাত বহুনিন্দিত 'কল্লোল' পত্রিকা এবং একদল তরুণ শক্তিশালী গল্পলেখক। প্রথম সমরোত্তর য়ুরোপীয় কথাসাহিত্য ও কাব্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ করিয়ে দিলেন 'কল্লোল' গোষ্ঠী, যেমন য়ুরোপীয় চিন্তাজগতের সঙ্গে পরিচয় করিতে দিলেন প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠী। 'সবুজপত্র' কেবল, ফরাসি গল্পের অনুবাদে নয়, ঐ জীবনদর্শনের অনুসরণে গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তার উদাহরণ 'চারইয়ারি কথা'। পাঁচ বছর বাদে 'কল্লোল' নরওয়ে, সুইডেন ও ইংলাণ্ডের প্রথম সমরোত্তর কথাসাহিত্য বাংলায় এনে দিলেন। ১৯২৩।২৫ খৃষ্টাব্দে তরুণ বাঙালি লেখকের উপাস্য দেবতা ছিলেন ক্নুট হামস্থন, যোহান বোর, সমারসেট মম্, ডি. এইচ্. লরেন্স, অলডাস্ হাক্সলি। সংস্কারমুক্তি, জীবনানুগত্য, বিজ্ঞান-সত্যের জয় ঘোষণা এবং অলজ্জ অকুণ্ঠ যৌবনবন্দনা বাংলা গল্পে এলো ; সেই সঙ্গেই এলো দুঃখকর পরিণতি—রবীন্দ্রনাথের কথায় —'লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন'। কিন্তু এই দুঃখকর পরিণতি বড় নয়, বড় হল পটভূমির বিস্তার, জীবনের সীমান্ত প্রসার এবং বোহেমিয়ান ও এ্যাডভেঞ্চার মনোভাবের জয়ঘোষণা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, যুবনাশ্ব, বুদ্ধদেব বসু এবং কিছুপরে প্রবোধকুমার সান্যাল ও

অন্নদাশংকর রায়—এঁরা য়ুরোপীয় গল্পের জীবনানুরাগ ও কঠোর সত্যভাষণ, রুক্ষতা ও নির্মমতা বাংলা গল্পে নিয়ে এলেন। এইসঙ্গেই এলেন আর দুজন—যাঁরা কল্লোলের না হয়েও কল্লোল-ধর্মী—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বসমরে সব ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। ধাতস্থ হতে আমাদের এবং তাবৎ দুনিয়ার বেশ খানিকটা সময় লাগল। তারপর বিদেশি গল্পের সঙ্গে আমাদের নোতুন করে পরিচয় স্থাপিত হল রুশ গল্প অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। যদিও এর পিছনে রাজনীতি সক্রিয় ছিল, তথাপি রুশ গল্পের সাক্ষাৎ পেলাম। কিন্তু, বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ায় মহৎ গল্পলেখক কোথায়? আর রুশ-প্রতিভার যোগ্য প্রকাশক্ষেত্র গল্প নয়, উপন্যাস। তাই রুশ গল্প আমাদের আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারল না যেভাবে ও যেরূপে ফরাসি গল্প সবুজপত্র-ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আর স্থায়ী প্রেরণাস্থল যে দুজন, তাঁরা এ কালের নন, পূর্বকালের—গোগোল ও গোর্কী। আর একথাও সত্যি যে মতবাদ—তা সে ধর্মেরই হোক আর রাজনীতিরই হোক—সাহিত্যে কোনো মহৎ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যেমন পারে উদার অকুণ্ঠ জীবনবোধ ও মানবপ্রেম, যা ফরাসি গল্পের মূলে বর্তমান। দ্বিতীয় সমরোত্তর ফরাসি গল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ নয়। তার জন্য দুঃখ করতে রাজি নই, কেননা হয় তা খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসী নীতিবাদী অথবা জীবনবিরোধী রূঢ় স্থূল অশ্লীলতায় পূর্ণ। তথাপি এরই মাঝে মাঝে মানবতার গান যখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে তখনই আশ্বস্ত হই।

বিদেশি গল্পের প্রেরণাউৎস আর বাকি রইল আমেরিকান, জর্মান, স্পেনীয় ও ইতালিয়ান্ গল্প। আমেরিকান গল্পের ফলশ্রুতি অসুস্থ বিকৃত উন্মত্ত জীবন-উপভোগের আমন্ত্রণ। সে আমন্ত্রণে সাড়া না দিলেই হয়ত বাংলা গল্পের উপকার হবে। তথাপি মাঝে মাঝে সুস্থ

জীবনচেতনার আশ্বাস ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। স্পেনীয় গল্প—দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যের জীবনানুরাগী চেতনার প্রকাশস্থল। আর ইতালিয়ান্ গল্প—নব-বাস্তবতার পথে মাটির মানুষের কাছাকছি পৌঁচেছে। আজকের ইংরেজি, আমেরিকান বা রুশ গল্পের কাছে প্রেরণা লাভের তেমন কিছু উপাদান নেই, এ সত্য অনস্বীকার্য। স্পেনীয় ও ইতালিয়ান গল্পের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধনে আমাদের যত্নবান হওয়া দরকার। বোধ করি আরেকটি আশ্বাসের স্থল—জর্মান গল্প। তবে টমাস মানের সঙ্গে যে যুগ চলে গেল, তাতে যে আশ্বাস ছিল, তা হয়ত আজ আর পাব না। তথাপি বিদেশি গল্পের সঙ্গে বাংলা গল্পের যোগাযোগের পথটি রুদ্ধ করে দিলে চলবে না।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার গুরুদায়িত্ব বাংলা ছোট গল্পেরই। আধুনিক জীবনের সমস্ত পরিবর্তন ও আলোড়নের প্রতিটি তরঙ্গের পরিচয় বিধৃত হয়েছে ছোট গল্পেই। বাংলা গল্পের সত্যনিষ্ঠা ও জীবনানুরাগ তাকে বিদেশি গল্পের পরিচয় গ্রহণে উন্মুখ করে তুলবে, এই প্রত্যাশা বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনার পশ্চাৎপটে রয়েছে।

# উপন্যাসের রূপসন্ধান

আধুনিক পৃথিবীর মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার সাহিত্য-রূপ উপন্যাস। উপন্যাসের রচয়িতা এ'যুগের সাহিত্যবিধাতা। তিনি বিধাতার মতোই শক্তিমান, সর্বগ, সর্বব্যাপ্ত, সর্বজ্ঞ। এ'যুগের মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির সকল প্রদেশে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। উপন্যাস এই শিল্পবিধাতার যোগ্যতম বাহন।

উপন্যাসের জন্ম শিল্পবিপ্লবের পরে—ব্যক্তিচেতনার উদ্বোধন ও সংশয়-যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাকালে। এই সত্যটি স্মরণে রাখলে আমরা উপন্যাসের আলোচনায় সুলভ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবো।

ইতালির বোকাচ্চিও, ইংল্যাণ্ডের চসার, ফ্রান্সের ফ্রাঁসোআ রাবল্যে এবং স্পেনের মিগুয়েল ছ সেরভান্তেস ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইয়োরোপে মধ্যযুগীয় রোমান্স-কাহিনী ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাঁচটি অমর গ্রন্থ রচনা করেন। বোকাচ্চিও লেখেন 'দেকামেরন', চসার লেখেন 'ক্যাণ্টারবারি টেলস্', রাবল্যে লেখেন 'গারগান্তুয়া', এবং 'প্যাঁতাগ্রুয়েল', আর সেরভান্তেস লেখেন 'ডন কিক্সট্ ছ লা মাঞ্চা'। এই পাঁচটি গ্রন্থেই মধ্যযুগীয় রোমান্সের অবিশ্বাস্য কল্পলোকের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় শৌর্যবীর্য ও অবাস্তব জীবনকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের শরাঘাতে ও যুক্তির নির্মম খোঁচায় বাস্তব ভূমিতে ধরাশায়ী করা হয়েছে। ইয়োরোপের মানুষের সামনে এঁরা এক নোতুন পৃথিবীর ছবি তুলে ধরলেন। সে পৃথিবী রোমান্সের কল্পলোক নয়, ধূলার ধরণী। এই পাঁচটি গ্রন্থের কোনোটাই যথার্থ উপন্যাস বা 'নভেল' নয় ; উপন্যাসের ইঙ্গিত মাত্র। এই চারজন ইয়োরোপের প্রথম আধুনিক শিল্পী।

ষোলো, সতেরো ও আঠারো শতকে স্পেনে, ফ্রান্সে উপন্যাসের প্রাথমিক সূচনা লক্ষ্য করা গেল। বিজ্ঞান-কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চার-উপাখ্যান, রম্য প্রেমবিবরণের মধ্য দিয়ে বাস্তবচেতনা ও মানব সংসারমুখিতার ইশারা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ফ্রান্সে মিশেল দ্য মঁতেন, ভোলত্যের, রুশো, দিদেরো এবং স্পেনে লেসেজ যুক্তির জয় ও বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করলেন। মানুষের আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন হলো, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে স্বাগত জানানো হলো এবং ধোঁয়াটে অধ্যাত্ম স্বর্গের পরিবর্তে স্পষ্ট চেহারায় ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। আঠারো শতকের ইয়োরোপের সাধারণ মানুষ এই উপলব্ধিতে উপনীত হলো—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' শিল্পবিপ্লব, নব নব বিজ্ঞানাবিষ্কার ও এশিয়া-আমেরিকার জলপথের সন্ধান ইয়োরোপের জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করলো। আর তখনই উপন্যাসের জন্ম হলো। ইতালি, জর্মানি, রাশিয়া, ইংলাণ্ডে নবতর জীবনচেতনার উদ্বোধন হলো এবং ফ্রান্স ও স্পেনের সহযোগীরূপে পৃথিবীর পথে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিকে নব রূপে প্রতিষ্ঠিত করলো।

আধুনিক পৃথিবীর প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যরূপে উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হলো।

চসারের কাছে মর্তমমতায় যে দীক্ষা ইংলাণ্ড গ্রহণ করেছিল, তা অচিরেই সুফল প্রসব করলো। ইতিমধ্যে সদ্যোক্ত স্পেনীয়, ফরাসি ও ইতালীয় গ্রন্থগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলো। আঠারো শতকের শিল্পবিপ্লব, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ও দ্রুত প্রসার উপন্যাসের আগমনকে ত্বরান্বিত করে তুললো। জন্ বানিয়ানের 'পিলগ্রিম্স্ প্রোগ্রেস্' ( ১৬৭৮ ), ডানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো' ( ১৭১৯), জোনাথান সুইফটের 'গালিভারস্ ট্রাভেলস্' ( ১৭২৭ )—এই তিনটি গ্রন্থে বাস্তবজীবনের প্রতি যে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল, তা-ই উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপনা করলো।

বাস্তব সংস্কারপ্রীতি, মানবজীবনের প্রতি আকর্ষণ ও ব্যক্তিচেতনার উদ্বোধন : এই তিনের যোগফল উপন্যাস। আঠারো শতকের মধ্য-বিন্দুতে ইংলাণ্ডে এই তিনের যোগাযোগে উপন্যাসের প্রকাশ ঘটলো। উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থপ্রকাশের ফলে উপন্যাসের পথ উন্মুক্ত হলো। রিচার্ডসন, ফিল্‌ডিং, স্মোলেট ও স্টার্ন—এই চারজনের প্রযত্নে উপন্যাসের প্রথম ফসল ইংরেজী সাহিত্যের ঘরে এলো।

রিচার্ডসনের 'পামেলা' ( ১৭৪০ ), 'ক্লারিসা হার্লো' ও 'স্যর চার্লস গ্রাণ্ডিসন'; হেন্‌রি ফিল্‌ডিং-এর 'জোসেফ অ্যাণ্ড্রুজ' (১৭৪২) ও 'টম জোন্‌স' (১৭৪৯); স্মোলেটের 'রোডরিক র‍্যাণ্ডম' (১৭৪৮) 'পেরিগ্রিন পিক্‌ল্' (১৭৫১), ও 'হামফ্রি ক্লিঙ্কার' (১৭৭১); এবং স্টার্নের 'ট্রিস্ট্রাম স্যাণ্ডি' (১৭৬০-৬৭) ও 'এ সেন্টিমেন্ট্যাল জার্নি' (১৭৬৩)—এই ক'টি প্রাথমিক ইংরেজি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিলো তিরিশ বছর (১৭৪০-১৭৭১) সময়সীমার মধ্যে। ইংরেজি উপন্যাসের আগামী প্রাসাদের ভিত্তি এই চারজন স্থপতি পাকা করে গেলেন। এরপর বিশ বছরেয় অজন্মা। তারপরই উনিশ শতকের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি উপন্যাস ফলে-ফুলে অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় আত্মপ্রকাশ করলো।

বস্তুত উনিশ শতকটি উপন্যাসের শতক। ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলাণ্ডে প্রতিভাধর মহাশক্তিশালী জীবনশিল্পীরা দেখা দিলেন। ফ্রান্সে স্তাঁধাল, অনরে দ্য বালজাক, আলেকজাণ্ডার ডুমা, জর্জ স াঁ, ভিক্তর য়্যুগো, গুস্তাভ ফ্লোব্যের, এমিল জোলা, আলফাঁস দোদে; ইতালিতে জিওভান্নি ভের্গা; স্পেনে জোস্‌মারিআ দ্য পেরেডা, হুয়ান ভালেরা, বেনিতো পেরেজ গালদোস; রাশিয়ায় নিকোলাই গোগোল, ইভান তুর্গেনেভ্, লিও টলস্টয়, ফিওদর ডস্টয়েভস্কী, আন্তন চেখফ; ইংলণ্ডে জেন অস্টেন, ওআল্টর স্কট, চার্লস ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিঅট, জর্জ মেরিডিথ, টমাস হার্ডি, ব্রণ্টে ভগিনীত্রয়; এবং আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে নাথানিয়েল হথর্ণ ও হারমান মেলভিল উপন্যাস-

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। তারপর বর্তমান শতকে উপন্যাস জনপ্রিয়তম সাহিত্যবাহনে পরিণত হয়েছে ও পৃথিবীর সকল দেশের সেরা লেখক উপন্যাসকেই আত্মপ্রকাশের মুখ্য বাহন রূপে গ্রহণ করেছেন।

উপন্যাসের রূপসন্ধানে বেরিয়ে তাই আমরা জানতে পারি, ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ধনতন্ত্রের আবির্ভাব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার ফলে উপন্যাসের জন্ম হয়েছিলো। মধ্যযুগ শিভ্যল্‌রি বা শৌর্যবীর্যের যুগ। তখন মানবচরিত্র, সমাজনীতি ও জীবনজিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছিলো মহাকাব্যের আশ্রয়ে। মহাকাব্যের শিল্পরূপ উদীয়মান ধনতন্ত্রের—বাস্তবচেতনা ও বিজ্ঞান-কৌতূহলের যোগ্য বাহন হতে পরে নি। বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, আত্মজিজ্ঞাসায় নিয়ত-অস্থির আধুনিক ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ মহাকাব্যে সম্ভব হলো না। স্বভাবতই অন্য কোনো প্রকাশবাহনের প্রয়োজন দেখা দিলো, এলো উপন্যাস। উপন্যাসের নোতুন শিল্পকর্মে আধুনিক যুগের জীবনজিজ্ঞাসা অনুকূল প্রকাশক্ষেত্র পেলো।

উপন্যাসের জন্ম ধনতন্ত্রের কোলে। কিন্তু সেখানেই সে স্থির হয়ে বসে নেই। সে এসেছে সমাজতন্ত্রের নবীন ভূমিতে। তার নব রূপ দেখা গিয়েছে। উপন্যাসের আগ্রহ অসীম, ক্ষুধা অপরিমিত, কৌতূহল অবারিত। তার ফলে আধুনিক যুগের সব কিছুকেই উপন্যাস আয়ত্ত করতে চাইছে। সমকালীন জীবনের প্রতি উপন্যাসের আকর্ষণ প্রবল, নিষ্ঠা অতুলনীয়। আর সে-কারণেই উপন্যাস বর্তমানের প্রিয় সাহিত্যবাহন।

উপন্যাস চলমান জীবনের শিল্পরূপ। তার দেহ আঁটসাট নয়, শিথিল-গ্রথিত। নিয়ত পরিবর্তমান ও ব্যাপক আয়তনযুক্ত এই শিল্পরূপ এযুগের লেখক ও পাঠকের কাছে সর্বাপেক্ষা আদরের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের স্থিতিস্থাপকতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা ও জীবনের অশেষ বৈচিত্র্য—এ দুয়ের যোগাযোগে উপন্যাস আশ্চর্য বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের রূপ-পরিবর্তন হয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। বিস্ময়কর তার প্রাচুর্য, আশ্চর্য তার জীবনশক্তি। কিন্তু একটি প্রশ্নের মুখ চাপা দেওয়া যায় না—তা হলো, উপন্যাসের ধারণবিন্দু কি? কোথায় তার মূল শক্তি? এর উত্তর—উপন্যাসের ধারণবিন্দু তার জীবননিষ্ঠা ওরফে সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবানুরাগ।

ইয়োরোপে উপন্যাসের সূচনা যে-সব গ্রন্থে হলো, তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাদের অন্যতম সতেরো শতকের স্পেনীয় লেখক সেরভান্তেস্-এর 'ডন কিক্‌সট্'। মধ্যযুগীয় শৌর্যবীর্যের হাস্যকর অসঙ্গতি, আড়ম্বর, অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গদৃষ্টি থেকেই 'ডন কিক্‌সট্' রচিত হয়েছে। সতেরো শতকের প্রথম দশকে স্পেনের জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতার সঙ্গে মধ্যযুগীয় নাইটদের শিভ্যল্‌রির কোনো সংযোগ ছিল না। সেরভান্তেস তাঁর গ্রন্থে সে-কথাটাই বুঝিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে মর্তমমতা ও সমকালানুগত্যের পরিচয় দিলেন।

ইংরেজি উপন্যাসের সূচনা-পর্বের দু জন প্রধান শিল্পী রিচার্ডসন ও ফীল্‌ডিং। রিচার্ডসনের লেখা 'পামেলা' উপন্যাসের (১৭৪০) নায়িকা পামেলা দাসীমাত্র। তারই প্রণয়-ইতিহাস লিখেছেন রিচার্ডসন। এই দৃষ্টির পিছনে সক্রিয় আছে সমকালীন জীবনানুগত্য। কিন্তু এতে যে অতিরঞ্জন ও হাস্যকর অসঙ্গতি ছিল, তা ফীলডিংকে 'জোসেফ অ্যাণ্ড্রুজ' (১৭৪২) লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে।

সোত্তর বছর পরে জেন অষ্টেন তৎকালীন ইন্দ্রিয়াশ্রিত উপন্যাস ও গথিক উপন্যাসকে আঘাত করেছেন যথাক্রমে দুটি উপন্যাসে—'সেন্স অ্যাণ্ড সেন্সিবিলিটি' এবং 'নর্দাঞ্জার অ্যাবি'তে। বাস্তব জীবন-প্রীতিই জেন অস্টেনকে এই আঘাত দানে প্ররোচিত করেছিলো।

আবার উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ভিক্টোরীয় উপন্যাসের ভাবালুতা, বাস্তববিচ্যুত কল্পনা ও জীবন সম্পর্কে মিথ্যা ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন বাস্তববাদ ( রিয়ালিজম ) ও প্রাকৃতবাদের ( ন্যাচারিলজম ) ধারক ঔপন্যাসিকেরা। আবার বর্তমান শতকের প্রথম পাদ অতিক্রান্ত হবার আগেই মূর, ওয়েলস্, বেনেট, গল্স-ওআর্দি প্রমুখ বাস্তববাদী ও প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে তরুণ লেখকরা বিদ্রোহ করলেন ও অভিযোগ করলেন পূর্বসূরীদের জীবনবোধ যথেষ্ট বাস্তবভিত্তিক নয়। এই বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় ঔপন্যাসিক হলেন লরেন্স, জয়স্, ভার্জিনিয়া উলফ। এঁরা আরো প্রত্যক্ষ, আরো ঘনিষ্ঠ, আরো ব্যক্তিগত বাস্তবতার রূপকার রূপে দেখা দিলেন।

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সব দেশেই—রাশিয়ায়, জর্মানিতে, ফ্রান্সে, বাংলাদেশে। সব দেশের ঔপন্যাসিকেরা অধিকতর বাস্তববাদী, ও জীবননিষ্ঠ হয়েছেন, আরো গভীর সত্যকে অন্বেষণ করেছেন এবং সর্বত্র পরবর্তীরা পূর্বসূরীদের উপন্যাসে জীবনানুগত্যের অভাব লক্ষ্য করেছেন।

তাই এ'কথা বলা যায়, উপন্যাসের অন্বিষ্ট জীবনসত্য, এবং শুধুই জীবনসত্য। এই সত্যের প্রতিষ্ঠা বাস্তব সমাজের কাঠামোর উপরে। তাই দেখি সমাজের কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য-বিস্তারী ইয়োরোপীয় সমাজে যে স্থায়িত্ব, স্থৈর্য, শান্তি ও সুখ বজায় ছিল, তা ক্রমবর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনে রোমান্টিকতা চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তখনকার উপন্যাস তাই প্রধানত রোমান্টিক উপন্যাস। তারপর উনিশ শতকের মধ্যবিন্দুতে নানা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে এই সমাজ-সংস্থিতি ও শান্তি বিচলিত হলো; বৈজ্ঞানিক সমাজচেতনা অনেক পুরনো মূল্যবোধকে

মর্যাদাভ্রষ্ট করলো; তার ফলে প্রেম, প্রকৃতি ও রোমান্টিকতার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দিলো ইতিহাসজ্ঞান, সমাজচেতনা ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। রমণীমোহন মিষ্টি কাহিনী অপসৃত হতে শুরু করলো, উনিশ শতকের তৃতীয় পাদেই উপন্যাসের রূপ পরিবর্তিত হলো—এলো রিয়ালিষ্টিক ও ন্যাচারালিষ্টিক উপন্যাস।

শুধু তাই নয়, ব্যঙ্গপ্রধান সমালোচনামূলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এলো ব্যঙ্গপ্রধান উপন্যাস ( স্যাটায়ারিক নভেল )। উপন্যাসের আয়তনও পরিবর্তিত হলো—বংশগতির ইতিহাস অবলম্বন করে উপন্যাস রচিত হলো—উপন্যাসে এলো মহাকাব্যের বিশ্বজাগতিক ( কসমিক ) চেতনা ও বিস্তৃতি। দেখা দিলো ঐতিহাসিক ও বংশগত ( ডিনাস্টিক ) উপন্যাস। উপন্যাসে এলো সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব। উনিশ শতকে কার্ল মার্কস, আর বিশ শতকে ফ্রয়েড, সোপেনহাওয়ের, নীটশে, ইয়ুং ও বের্গসঁর তত্ত্ব উপন্যাসে গুরুগম্ভীর ছায়া ফেললো। দেখা দিলো দর্শনভিত্তিক ( ফিলজফিক্যাল ) উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক ( সাইকো-লজিক্যাল ) উপন্যাস, কাব্যপরিবেশপ্রধান ( পোয়েটিক ) উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক ( অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ) উপন্যাস। আরো দেখা দিলো আঞ্চলিক ( রিজিওন্যাল ) উপন্যাস, রাজনীতিভিত্তিক ( পোলিটিক্যাল ) উপন্যাস।

এখানেই শেষ নয়। উপন্যাসের শেষতম রূপ 'চেতনাপ্রবাহের উপন্যাস' ( 'স্ট্রিম অফ্ কন্‌শাসনেস্ নভেল্' )। ডরোথী রিচার্ডসন, জেমস্ জয়স্, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, মার্সেল প্রুস্ত, রবার্ট মুজিল ও ফ্রানজ কাফকার উপন্যাসে এই রীতি গৃহীত হয়েছে। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জয়স্-এর 'ইউলিসিজ' ( ১৯২৫ ), এর প্রথম উদাহরণ ডরোথী রিচার্ডসনের 'পয়েন্টেড রুফস্' ( ১৯১৫ )। ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর 'সাইকো-থেরাপি' বিদ্যা এই রীতির পশ্চাৎপট। এই রীতিতে মানবমনে উত্থিত সকল চিত্রকল্পের ( ইমেজ )

স্বতন্ত্র স্পষ্ট রূপ কল্পনা করা হয় এবং তা মনের চারদিকে একটি অবিরাম প্রবাহ রচনা করে বয়ে চলেছে, এই ধারণার ভিত্তিতে সেগুলিকে পারম্পর্যবিহীনভাবে ছন্দহীন এলোমেলো রূপে বহির্জগতে আনা হয়। 'ইউলিসিজ' উপন্যাসের ঘটনাকাল একটি দিন—চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র। ডাবলিনে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনটি প্রধান চরিত্রের মনোজগতে যে চেতনাপ্রবাহের উত্থান-লয়-পতন হয়েছিলো, জেমস্ জয়স্ তারই রূপকার। এখানে ঘটনা অপ্রধান, কাহিনী গৌণ, গল্পের নিটোল পরিণতি মূল্যহীন। চেতনাপ্রবাহই প্রধান বিষয়। চেতন অবচেতন, দুই জগতের যোগসূত্র বজায় রেখে ব্যক্তি-মানসের সমগ্র সত্তাকে বিপুলায়তন উপন্যাসের কাঠামোয় ধারণের প্রয়াসই এই শ্রেণীর উপন্যাসের মূল সাধনা।

এইভাবে দেখি উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। আসল কথা, শিল্পকর্মরূপে উপন্যাস আশ্চর্য স্থিতিস্থাপক, তা বহু পরিবর্তনকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে এবং তার ধারণশক্তি সীমাহীন। তাই উপন্যাসকে কোনো সংজ্ঞার মধ্যে বেঁধে ফেলা অসম্ভব।

উপন্যাসের দিন শেষ হয়ে এলো, এমন আশংকা কেউ কেউ করেছেন। সত্যি কি তাই? যে শিল্পকর্ম নিয়তই পরিবর্তিত হতে পারে, তার মৃত্যু নেই, নিয়তই তার রূপান্তর ও জন্মান্তর হচ্ছে।

উপন্যাসের রূপ-সন্ধান করলে স্থূল বিচারে দুটি রূপ চোখে পড়ে—একটি উনিশ শতকের উপন্যাস, অপরটি বর্তমান শতকের উপন্যাস—নোতুন আর পুরনো।

পুরনো উপন্যাসে গল্পের রাজ্য ছিল প্রলম্বিত, বিস্তারিত। পাতার পর পাতা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় পাড়ি দিয়ে পাঠক সানন্দে নিরুদ্বেগ মন্থর গতিতে চলতেন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে, তাদের সুখদুঃখ ও ভালোমন্দের অংশভাগী হতেন, তাদের দুঃখে দুঃখী ও ও সুখে সুখী হতেন। এই পুরনো উপন্যাস কাহিনীপ্রধান, কিন্তু কাহিনীসর্বস্ব

নয়। কাহিনীর রসটাই এই উপন্যাসে প্রধান স্থান অধিকার করতো; কিন্তু সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব বক্তব্য ও জীবনজিজ্ঞাসাও থাকতো। কোনো পাঠক গল্পরসেই মজে যেতেন, কেউ-বা লেখকের জীবনদর্শনকেও খুঁজে নিতেন। পুরনো উপন্যাস তাই সকল শ্রেণীর পাঠকের অধিকারগম্য ছিল। টলস্টয়, স্তাঁধাল, ফ্লোব্যের, বালজাক, আনাতোল ফ্রাঁস, ডিকেন্স, হার্ডি, মেরিডিথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—এঁরা সকলেই এই ধারাটি গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের উপন্যাস উপভোগ করেছেন দেশে-দেশে সংখ্যাহীন পাঠক। মুগ্ধ হয়েছেন গল্পরসে, জীবনের ব্যাপক পটভূমিতে নরনারীর বিচিত্র জীবনলীলা দর্শন করে অভিভূত হয়েছেন, কিন্তু উপন্যাসের মর্মসত্য উপলব্ধি করেছেন অল্প পাঠকেই। কিন্তু কেউই বঞ্চিত হন নি।

নোতুন উপন্যাসে গল্পের ভাগ কম, পাঠকের পরিচিত জগতের সন্ধান কম, মানবসংসারের প্রধান মানবিক অনুভূতিতে দোলায়িত চেনা মুখের সংখ্যাও কম। এর ফলে উপন্যাসপাঠকের পক্ষে সব উপন্যাস অধিকারগম্য নয়। জেমস জয়স্, ফ্রান্জ কাফকা, ডরোথী রিচার্ডসন, মার্সেল প্রুস্ত, প্যারানডাওস্কি, বার্ন গ্রেবার, অল্ব্যের কামু, রবার্ট মুজিল প্রমুখের চিন্তালোক ও সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতালোকের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বর্তমান। গল্পপ্রিয় পাঠকের পক্ষে এঁদের লেখা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই অভিজ্ঞতালোকের ও চিন্তার জন্মান্তর, আর তার জন্য চাই সাধনা। আজ তাই নোতুন উপন্যাস সহজগম্য নয়, তা দুরধিগম্য, সাধনালভ্য।

আধুনিক কালের জীবন কেবল বিচিত্র নয়, তা জটিল। এই জটিল জীবনের শিল্পরূপ যে উপন্যাস, তাও জটিল হতে বাধ্য। এই সাহিত্যকর্মেই এ-যুগের জটিল মন ধরা দিয়েছে। উপন্যাসকে তাই বলা যায় আধুনিক কালের মহাকাব্য আর ঔপন্যাসিককে বলতে পারি এ-যুগের সাহিত্যলোকের বিধাতা।

উপন্যাসের দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা নিয়ে যে-সব বাধার সম্মুখীন হতে হয় এ-কালের পাঠককে, সে সমস্যার কোনো সুলভ সমাধান আছে বলে আমার মনে হয় না। ডরোথী রিচার্ডসনের 'পিলগ্রিমেজ' উপন্যাসের নায়িকা মিরিয়ম এক কথায় এই সমস্যামুক্তির পথনির্দেশ করেছে। সে বলেছে, 'I don't read books for the story, but as a psychological study of the author'। গল্পের ঘটনা, চরিত্র, রোমান্টিক বিষয়বস্তু মিরিয়মের কাম্য নয়, সে খুঁজে পেতে চায় লেখকের মনস্তত্ত্ব, আর এই আবিষ্কার তাকে উত্তীর্ণ করে দেবে নবতর জীবনবোধে। উপন্যাসের রূপ-সন্ধান করতে গিয়ে আমরা মিরিয়মের কথারই পুনরুক্তি করি—ঘটনা নয়, জীবনকে চাই; বস্তু নয়, লেখক-মনকে চাই; গল্প নয়, জীবনরহস্যকে চাই।

উপন্যাসের রূপসন্ধানে বেরিয়ে প্রখ্যাতা ঔপন্যাসিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ যে ফল লাভ করেছেন, 'দ্য কমন রীডার' গ্রন্থে 'দ্য মডার্ণ নভেল' প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক ঔপন্যাসিকের সাধনা ও সিদ্ধি, প্রত্যয় ও প্রাপ্তি, সংশয় ও বিশ্বাসের একটি সুন্দর ছবি তিনি দিয়েছেন। এই পরিক্রমা-অন্তে তিনি যে-কথা বলেছেন, আশা করি এ'কালের ঔপন্যাসিক মাত্রেই তাতে সায় দেবেন:

Admitting the vagueness which afflicts all criticism of novels, let us hazard the opinion that for us at this moment the form of fiction most in vogue more often misses than secures the thing we seek. Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing, has moved off, or on, and refuses to be contained any longer in such ill-fitting vestments as we provide. Nevertheless, we go on perseveringly, conscientiously, constructing our two and thirty chapters after a design which more and more ceases to resemble the vision in our minds.

So much of the enormous labour of proving the solidity, the likeness to life, of the story is not merely labour thrown away but labour misplaced to the extent of obscuring and blotting out the light of the conception. The writer seems constrained, not by his own free will but by some powerful and unscrupulous tyrant who has him in thrall, to provide a plot, to provide comedy, tragedy, love interest, and an air of probability enbalming the whole so impeccable that if all his figures were to come to life they would find themselves dressed down to the last button of their coats in the fashion of the hour. The tyrant is obeyed ; the novel is done to a turn. But sometimes, more and more often as time goes by, we suspect a momentary doubt, a spasm of rebellion, as the pages fill themselves in the customary way. Is life like this ? Must novels be be like this ?

Look within and life, it seems, is very far from being 'like this'...........Life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged ; life is a luminous halo, a semitransparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display, with as little mixture of the alien and external as possible ?

ঔপন্যাসিক জীবনশিল্পী এই অর্থেই। তিনি জীবনের রূপ, অর্থ ও নবতর ব্যঞ্জনা সন্ধান করে ফেরেন। এখানেই তিনি জীবনের রূপকার, জীবনের ভাষ্যকার।

## উপন্যাসের যুগে

প্রখ্যাত ফরাসি সমলোচক সাঁত্ ব্যুভ্ একদা বলেছিলেন, উপন্যাস একদিন সাহিত্যের বাজার দখল করে নেবে। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। আজকের সাহিত্যসংসারে উপন্যাসের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তাই হয়েছে। মাসিক পত্রিকার চাহিদা থেকেই অনুমান করা যায়, উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কত বেশি। প্রকাশকেরা উপন্যাসের জন্য যে টাকা দিতে রাজি আছেন, তা আর কোন বিষয়ে দিতে চান না।

আমাদের বাংলা উপন্যাস প্রেরণা পেয়েছিল আজ থেকে এক শ বছর আগে ইংরেজি উপন্যাস থেকে। শুনলে আশ্চর্য মনে হয়, ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম নিতান্তই আকস্মিক ও প্রেরণাহীন উদ্যোগ থেকে। ইংরেজি উপন্যাসের জনক রিচার্ডসন তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন একটি ঝি-কে নিয়ে, তার নাম পামেলা। উপন্যাসটির নামও 'পামেলা'। কাহিনী মোটেই উঁচুদরের নয়—পামেলার প্রণয়-অভিজ্ঞতা ও নির্যাতনের দৈনন্দিন তুচ্ছতম কাহিনীই এই উপন্যাসের উপজীব্য। এই বর্ণনার দুটি গুণ ছিল—লেখকের সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবভিত্তিক নিপুণ বর্ণনা। দৈনন্দিন রূঢ় ক্লেদাক্ত বাস্তব থেকে ইংরেজি উপন্যাসের জন্ম হলো, তা এক নোতুন সাহিত্য সৃষ্টির স্বর্ণদ্বার খুলে দিলো। দাসীর প্রণয়-অভিজ্ঞতামূলক পঙ্কস্তরে যার জন্ম, পরে সে সৃষ্টি করল অম্লান পঙ্কজ। আধুনিক ইংরেজি উপন্যাস কেবল ইংরেজের নয়, বিশ্ববাসীর আনন্দের উৎস। রিচার্ডসনের কাছে যা ছিল ক্লেদাক্ত বাস্তবতা পরবর্তীকালে তা বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠাপূর্ণ অসাধারণ কাব্যগুণান্বিত বাস্তবে পরিণত হলো। আজকের

বাস্তবতায় অনেক গূঢ় অর্থ ও ব্যঞ্জনা এসেছে, তা রোমান্সের বিরুদ্ধে বর্শা উদ্যত করেছে, জীবনকে দেখেছে সত্যদৃষ্টিতে, মানুষকে দিয়েছে অভাবনীয় মহিমা, সকল মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি পেয়েছে সহানুভূতি ও বিশ্লেষণ, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জীবনে আরোপিত হয়েছে অমৃতের অভিব্যঞ্জনা। রিচার্ডসন থেকে স্কট, স্কট থেকে ডিকেন্স, ডিকেন্স থেকে জর্জ এলিঅট, জর্জ এলিঅট থেকে জেমস জয়স্, জয়স্ থেকে লরেন্স : নোতুন পথাবিষ্কারে ও অভিযানে ইংরেজি উপন্যাস দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

বাংলা উপন্যাস তার প্রেরণাদাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমানতালে এগিয়েছে কিনা, তা বিচার্য। টেকচাঁদ ঠাকুরের বা হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাকে রিচার্ডসন-ফীলডিংএর রচনার সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং তা করা উচিত। তারপরই বাংলা উপন্যাসের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পর্ব—সে পর্বে রোমান্সের সমারোহ। দৈনন্দিন জীবন সে পর্ব থেকে নির্বাসিত। জীবনের অসাধারণ মুহূর্তগুলি সেখানে চোখ-ধাঁধানো মিছিল করে যায়। ঐতিহাসিক ও পারিবারিক রোমান্স সৃষ্টির আনন্দেই তা মুগ্ধ ও আবদ্ধ। গত শতকে বঙ্কিমের পথানুসারী ঔপন্যাসিকই বেশি। এঁদের পাশে এককোণে আছেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্ণলতা' নিয়ে। রোমান্সের মিছিলের পাশে এ-যেন শান্ত গৃহকোণে বাস্তবের আরতি।

দুঃখের বিষয়, সেদিন 'স্বর্ণলতা' পরাজিত হয়েছে দেবীচৌধুরাণী-দলনী বেগম-শ্রীর কাছে। তাই মাটির গল্প (down-to-earth-story) সেদিনও আমরা পাইনি। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র আলিবাবার রোমান্স-গুহার দ্বার খোলার যে গুপ্ত মন্ত্রটি জানতেন, তা তাঁর অনুকারীবৃন্দ জানতেন না, ফলে তাঁদের 'চল্লিশ দস্যুর দশা হল।

এরপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নোতুন পথ কেটে বার করলেন। তিনি রোমান্সের দিকে পিঠ ফেরালেন ; নিতান্তই সাধারণ

গৃহস্থজীবনের ঘরোয়া কাহিনীকে মর্যাদা দিলেন। ইতিহাসের মিছিলে তিনি গেলেন না, নিতান্তই ছোট সুখ-দুঃখ নিয়ে মালা গাঁথলেন। সমাজে যে ছিল অবজ্ঞাত তাকে দিলেন সম্মানের আসন, সুরু হল বাংলা উপন্যাসে বিধবার জয়যাত্রা—'চোখের বালি'তে তার সূচনা, 'চরিত্রহীনে' তার পরিণতি। নিষিদ্ধ প্রেম যা এতদিন ছিল নিষিদ্ধ ফল, তা রবীন্দ্রনাথ পেড়ে আনলেন, কেবল তাই নয়, বাঙালি পাঠককে তার আস্বাদ পেতে দিলেন। কিন্তু শুধু কি এই? এখানেই কি শেষ?

না, আমরা পেলাম 'ঘরে-বাইরে'র বিমলাকে। একই নারী দুটি পুরুষের প্রতি আসক্ত হল—কাউকেই সে ছাড়তে পারে না। নিখিলেশ—সন্দীপ: কাকে সে ছাড়বে? 'গৃহদাহে'র অচলারও ওই এক প্রশ্ন—কাকে সে ছাড়ে—সুরেশ ও মহিম—দুজনেই তাকে টানে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্নের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন, 'শেষ প্রশ্নে' তারই উচ্চকিত আলোচনা।

শরৎচন্দ্র এলেন, তিনি নারীহৃদয়ের গোপন রহস্যভেদে বিশেষ চেষ্টা ( গৃহদাহ-শেষপ্রশ্ন ছাড়া ) করেননি। তিনি জীবনের যে অংশের প্রতি তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন, তা কেন্দ্রদেশ নয়, সীমান্ত-প্রদেশ। পতিতাই সতীত্বগুণে ভূষিতা, বাঙালি সংসারে নারীই প্রবলা—পুরুষ নির্জীব ও স্নেহাকাঙ্ক্ষী, বিমাতাই মাতৃস্নেহের প্রতিমা—এ ক'টি বিষয় ছাড়া আর কিছু তিনি করেননি। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব তাই এখানে নয়, অন্যখানে। সে কোথায়? সমাজের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অবমানিত মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণায়—সেখানে বাস্তবতা রূঢ়, অথচ সত্যে তার প্রতিষ্ঠা: পল্লীসমাজ যে স্বর্গনিকেতন নয়, তা যে নিষ্ঠুর, অমানুষ—তা তিনিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'অরক্ষণীয়া' পড়ে আমাদের হৃদয় আঘাতে অসাড় হয়ে যায়।

কিন্তু তারপর কোথায় যাই ? সেই নোতুন পথের সন্ধান দিলেন কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ ঔপন্যাসিকেরা—তাঁরা বাংলা উপন্যাসকে নোতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছেন। 'বেদে', 'যাযাবর', 'নারীমেধ' ছাড়িয়ে আমরা এগিয়েছি—প্রেমের নব নব প্রকাশ, অবমানিত জীবনের দুর্লভ মর্যাদা—এসব তাঁদের কাছেই আমরা পেয়েছি। এ-যুগের রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথ প্রশস্ত করেছেন। তাঁর শেষ চারটি উপন্যাস আমাদের পথকে সুগম করেছে।

বঙ্কিমের গুরু ছিলেন স্কট। অথচ তার সমসাময়িক ইংরেজ ঔপন্যাসিক ছিলেন ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিঅট, মেরিডিথ, হার্ডি। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাস থেকে এক শ বছর পেছিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কাউকে অনুসরণ করেন নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র উনিশ শতকের ইংরেজি ঔপন্যাসিকদের পথরেখা অনুসরণ করেছিলেন, একথা অনস্বীকার্য।

কিন্তু আজকে—উপন্যাসের যুগে—বাংলা উপন্যাস মহাকালের দরবারে পৌঁছে দেবার মতো কিছু সৃষ্টি করছে কি ?

বাংলা উপন্যাসের ভূগোল সম্প্রতি কিছু প্রসারিত হয়েছে, একথা সত্য। মানিক, শৈলজানন্দ, তারাশংকর আঞ্চলিক উপন্যাস ( regional novel ) রচনা করে বাংলা উপন্যাসের পরিক্রমা-পথ দীর্ঘতর করেছেন। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আমাদের উপন্যাসে কন্‌রাড নেই কেন ? হরিনারায়ণ, শচীন্দ্রনাথ, রমাপদ, নবেন্দু, সমরেশ, প্রফুল্ল, বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের কাছে আমরা এক বিষয়ে কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা বাংলা উপন্যাসের মানচিত্রকে প্রসারিত করেছেন। ব্রহ্মদেশ, ভারত মহাসাগর, কংকণ-উপত্যকা, মহুয়াফুলের দেশ থেকে তাঁরা আমাদের ঘুরিয়ে এনেছেন।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়—আজো আমরা যথার্থ নাগরিক উপন্যাস লিখতে পারলাম না কেন ? শরৎচন্দ্র থেকে বিভূতিভূষণ,

তারাশংকর থেকে মানিক ঃ সবাই পল্লীগ্রামকে আশ্রয় করে এগিয়েছেন। শহরতলীর ইতিকথা যদিও বা লেখা হয়েছে, তথাপি বিশুদ্ধ নাগরিক জীবন নিয়ে লেখা হল না কেন? আসলে আমরা শহরে থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মন পড়ে আছে গ্রামের দিকে। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা'। একটি জটিল নাগরিক ব্যক্তিত্বের আত্মসংকট ও মানবিক মূল্যবোধে আস্থানুসন্ধান এই ত্রয়ী উপন্যাসে পাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর দ্বিতীয় সঙ্গীর সাক্ষাৎ পেলাম না।

সাম্প্রতিক উপন্যাস সম্পর্কে একটি নোতুন অভিযোগ উঠেছে—তা হয়ে পড়ছে ডক্যুমেন্টারী। প্রয়োজনীয় উপাদানের সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু তা সামগ্রিক রসবস্তুতে পরিণত হয়নি। এই অভিযোগের উল্টো পিঠ—আজকের উপন্যাস হয়ে পড়েছে আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত ( fragmentary )। এ দুই অভিযোগের জবাব আজকের বাঙালি ঔপন্যাসিককে দিতে হবে।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন ঃ মহৎ উপন্যাস আজকের বাঙালি ঔপন্যাসিক লিখতে পারছেন না কেন? একথা ঠিক, পিরামিডের দিন চলে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না। তথাপি আজকের বাংলা উপন্যাসসংসারে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বেশ কয়েকজন আছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্থক শিল্পী অনেকেই আছেন। টমাস মান আমাদের দেশে না থাকতে পারেন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বা ম'ম কেন থাকবেন না? টমাস মান গত যুগের মহৎ উপন্যাসকারদের শেষ প্রতিনিধি; তাই তাঁকে বাদ দিতে পারি। কিন্তু আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বা সমারসেট ম'ম্ এদেশের মাটিতে জন্মাবেন না কেন? 'পথের পাঁচালী' আমাদের মহৎ উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম ও শেষ উদাহরণস্থল নিশ্চয়ই নয়। তবে কে কোথায় আছেন? উপন্যাসের নামে বড় গল্প লেখার দিন কি আজো শেষ হয়নি? মহৎ উপন্যাস লেখার জন্য যে

সাধনা ও ধৈর্য প্রয়োজন, তা কি আমাদের লেখকরা আজো অর্জন করেন নি ? 'গোরা' উপন্যাসের অনুবর্তী কোনো উপন্যাস আজো এলো না কেন ?

শরৎচন্দ্র প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন—ঔপন্যাসিকের পক্ষে এ-কালের বাঙালি জীবন উৎকৃষ্ট উপাদান। আজ আমাদের ভুলতে হবে—বাঙালি জীবন কেবল ছোট গল্পেরই উপাদান। আমাদের বাঙালি-জীবনে আজ সমস্যা ও টানা-পোড়েনের শেষ নেই। সামন্ততন্ত্র ও ধনিকতন্ত্র হিন্দু ও মুসলমান, গ্রামজীবন ও নগরজীবন, মধ্যবিত্তের ভিত্তিহীন আভিজাত্য ও জীবনসংগ্রামের তাগিদ, শাস্ত্রে ভক্তি ও বিজ্ঞানে আকর্ষণ, জন-সংস্কৃতি ও ভদ্র-সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও সমাজ তান্ত্রিক সংস্কৃতি : এই সব বিপরীত বিন্দুর আকর্ষণ-বিকর্ষণে আজকের বাঙালি ক্ষত-বিক্ষত। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দোলাচল-চিত্ততা কি উপন্যাস রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? আমার বিশ্বাস, এখানেই রয়েছে মহৎ উপন্যাসের বীজ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ও দু খণ্ড 'অপরাজিত' অন্নদাশংকরের 'সত্যাসত্য', তারাশংকরের 'হাসুলি বাঁকের উপকথা', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা-আবর্ত মোহনা' সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' বিমল করের 'দেওয়াল', 'বনফুলের 'স্থাবর-জঙ্গম' প্রভৃতি উপন্যাসে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা কি ফলবতী হয়ে উঠবে না ? আজ তাই অপেক্ষা করব সেই মহৎ বাঙালি ঔপন্যাসিকের জন্যে—যিনি সমাজ-সচেতন, যিনি নিরাসক্ত অথচ সহানুভূতিশীল, যাঁর কাছে জীবন খণ্ড দৃষ্টিতে নয়, পরন্তু অখণ্ডরূপে ধরা দেয়। আজকের উপন্যাসের যুগে এতগুলি সৃষ্টিক্ষম বাঙালি ঔপন্যাসিকের সাধনা বিফল হবে না, এই বিশ্বাসেই এ প্রবন্ধের সমাপ্তি।

# বাংলা কথাসাহিত্যে ইয়োরোপ

বাংলা সাহিত্য ও সমাজের নবজাগরণের মূলে আছে ইয়োরোপ। উনবিংশ শতকে সমাজে ও সাহিত্যে, কর্মে ও মননে বাঙালি যে অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় নিজেকে প্রকাশিত করতে পেরেছিল, তার মূল কারণ ইয়োরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন। এই মিলন কেবল প্রশাসনিক সংযোগ নয়, তার চেয়ে গভীরে এই মিলন ঘটেছে—চিত্তলোকে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারি, "ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষেয় ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম।" (কালান্তর)।

ভারতবর্ষের মনোভূমি গত শতাব্দে মরুভূমির ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি, ভারতবর্ষের চিত্ত শস্যে শ্যামল হয়ে উঠেছে। আর তারই মধ্যে বাংলা দেশের চিত্তভূমি সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রাণশক্তিসম্পন্ন শস্যশালিনী ক্ষেত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেদিনের বাংলা সাহিত্য তার পরিচয়-স্থল। সে পরিচয়ের বড়ো কথা, বাংলা সাহিত্য প্রাণের দোসর হয়ে উঠেছিল, নবজাগরণের আঘাতে জাগ্রত বাঙালি আপন সাহিত্যেই

নিজের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আনন্দের প্রতিচ্ছবি দেখেছিল। এই নবজাগরণের জোয়ারে সেদিন বাঙালির সঙ্গে জেগে উঠেছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের চিত্ত।

বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপের প্রবেশ তাই বাহ্যিক প্রভাব মাত্র নয়, ইয়োরোপের যৌবনের সুরে সেদিনের বাঙালি মন সুর বেঁধে নিয়েছিল। এই মিলনের পশ্চাৎপটে চিন্তালোকে যে ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন ঘটেছিল খুব সংক্ষেপে তার পরিচয় গোড়ায় গ্রহণ করা যাক্।

ইয়োরোপ থেকে মানবিক মূল্যবোধের ( Human values ) ধারণা সেদিন বাঙালি গ্রহণ করেছিল। প্রাক্-ইংরেজ আমলের ( মুসলমান আমলের ) বাংলা সাহিত্যে মানুষের আত্মাবমাননা ও দেবতার জয় ঘোষণাই প্রথম ও শেষ কথা। "অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে।" ( রবীন্দ্রনাথ ঃ কালান্তর )।

ইয়োরোপের দূত ইংরেজি সাহিত্য এর বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধকে দাঁড় করিয়েছে। দেবতার অন্যায় পরাক্রমকে ভয়-ভক্তি করার দিন শেষ হলো, এলো মানুষের নিজের 'পরে শ্রদ্ধা। "যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন।" ( 'কালান্তর' )। আত্মাবমাননার জায়গায় এল আত্মসম্মান, দৈবানুগ্রহের পরিবর্তে এল আপন শক্তির 'পরে অগাধ বিশ্বাস। কবিবাক্যে এই তত্ত্বটি আমরা সেদিন গ্রহণ করেছিলেম : A man is a man for a' that।

মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহ সেদিন যাঁদের চরিত্রে ও সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে নাম করতে পারি রাজা রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

দ্বিতীয় যে পরিবর্তন বাঙালীর চিন্তালোকে দেখা গেল—তা হলো নর-নারীর সম্বন্ধ বিষয়ে। বাঙালি নবজাগরণের প্রথম প্রহরে নারী-মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। বোধ করি বহুকালের অবহেলার প্রবল প্রতিক্রিয়ায় নারীর প্রতি বাঙালি সাহিত্যিকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনখানি আখ্যানকাব্যই নারীর নাম বহন করছে; মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কবি নারীর ক্ষাত্র-প্রেমকে কাব্য-বারিতে অভিষিক্ত করেছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী ('বঙ্গসুন্দরী'), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ( 'মহিলা কাব্য' ) দেবেন্দ্রনাথ সেন ( 'নারীমঙ্গল' কবিতা ), অক্ষয়কুমার বড়াল ( 'এষা' )—সকলেই নারীর বন্দনা করছেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দিয়েছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারী স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো।

তৃতীয় পরিবর্তন ঘটল আমাদের দেশচেতনায়। উনিশ শতকেই বাঙালি কবি স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। গত শতকের পূর্ব পর্যন্ত স্বদেশকে পৃথকভাবে বন্দনাকে করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব।" ( 'বাংলাভাষা পরিচয়' )। ইংরেজি পেট্রিয়টিজম সেদিন বাংলা কাব্যে ও উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমে রূপান্তরিত হলো। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম্'

সংগীত এর সার্থক উদাহরণ। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্য' দেশপ্রেমের আখ্যানকাব্যরূপে দেখা দিল। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়'-প্রমুখ স্মরণীয় চরণ-গুলিতে ইংরেজ কবি Moore-এর 'From life without freedom, Oh! who would not fly'-এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য ভাবানুপ্রাণিত লেখায় স্বদেশ-প্রেমের সুর শোনা গেল।

চতুর্থ পরিবর্তনটি সূচিত হ'ল একটি সম্পূর্ণ নূতন চিন্তার আগমনে —রিপাবলিক্যান ধারণা (Republican spirit) আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে এল। এর দুই প্রধান হোতা হলেন শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। আমাদের রাষ্ট্রীক চিন্তার দিগন্ত এই দুই মনীষীর লেখায় প্রসারিত হল—বিশ্বমানবতার ধারণা এঁদের কাছেই পেলাম।

পঞ্চম পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান-দৃষ্টি আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে দেখা দিল। বিজ্ঞানের মোহমুক্ত সত্যান্বেষণ আমাদের জীবনের অনেক চিন্তার মোড় ফেরাল, জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত ও অন্যপথে চালনা করল। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ চিন্তাবীর তাঁদের রচনায় বিজ্ঞানদৃষ্টিকে প্রাধান্য দিলেন, ভাবাবেগের কুয়াশা ও ভাবালুতার বন্যা থেকে উদ্ধার করে আমাদের বিজ্ঞানবুদ্ধির দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ষষ্ঠ ও শেষ পরিবর্তন হ'ল আমাদের দর্শন-চিন্তায়। প্রাচ্য দর্শনলোকের অধিবাসী বাঙালিরা গত শতকের অষ্টম দশকে পাশ্চাত্ত্য দর্শনচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হ'ল। আমাদের ঈশ্বরচিন্তা, অধ্যাত্মবিশ্বাস ও ভক্তিবিহ্বলতা পাশ্চাত্ত্য সংশয়চিন্তার আঘাতে বিচলিত হ'ল। সেদিনের নব-জাগ্রত বাঙালি ও ভারতবাসী টিণ্ড্যাল, হাক্সলি, মিল, ডারউইন, হারবার্ট স্পেন্সার-প্রচারিত বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিরহস্যের

জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হ'ল। নিরীশ্বরবাদ ( Agnostic beliefs ) ও নাস্তিকতা প্রাধান্য পেল। আবার কাব্যলোকে শেলী, কোলরিজ, ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, মিল্‌টন, টেনিসন প্রচারিত অধ্যাত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাসচ্যুতির দুই প্রান্তে বাঙালির মন আন্দোলিত হল; নীট্‌শে ও শোপেনহাওয়ের-প্রচারিত জর্মান দর্শনচিন্তার বৈপ্লবিক ধারণায় অভিভূত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশ্বাসের নানা পরিবর্তনে এই চিন্তা-বিপ্লবের স্বাক্ষর রয়েছে। বঙ্কিমের সেই অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা: 'এ জীবন লইয়া কি করিব'? সেদিনকার বাঙালি-চিত্তে উপরোক্ত চিন্তাবিপ্লবেরই প্রতিধ্বনি।

ঐ সময় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আমাদের জীবন-মনকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে আমাদের দুই পুরুষ আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মৌল গুরুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

এখন বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপের অনুপ্রবেশের ধারাটি লক্ষ্য করা যাক্। বাংলাকাব্যে ইয়োরোপের আগমন হ'ল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচনায়, এ আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। সেদিন বাঙালির প্রিয় কবি ছিলেন বায়রন ও মিল্‌টন, তারপর শেলী। নাটকে বহু-অনুসৃত, বহু-অনূদিত ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র। কিন্তু কাব্যে ও নাটকে বাঙালি সাহিত্যিকের মৌলিক রচনায় ইয়োরোপ অনুপস্থিত ছিল—প্রত্যক্ষ পটভূমি বা ইয়োরোপীয় চরিত্র সেদিনের কাব্য-নাটকে ছিল না। আধুনিক বাংলা কাব্যের সঙ্গে সমকালীন ইউরোপীয় কাব্যের যোগ নিবিড়।

গদ্যসাহিত্যেই ইয়োরোপ প্রত্যক্ষরূপে প্রথম আবির্ভূত হ'ল এবং সে আবির্ভাব স্বভাবতই ভ্রমণ-সাহিত্যে। গল্প-উপন্যাসে ইয়োরোপকে সশরীরে গ্রহণের পূর্বের ধাপ ইউরোপ-ভিত্তিক ভ্রমণ-সাহিত্য।

ভ্রমণ-সাহিত্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি বাংলা সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ রবীন্দ্রনাথ। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি,' 'পথে ও পথের প্রান্তে' ও 'যাত্রী' গ্রন্থ-চতুষ্টয় রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপ-ভ্রমণের আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। ইয়োরোপের চঞ্চল জীবনস্রোত কবিকে কী ভাবে প্রভাবিত করেছে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে—কৈশোরের প্রথম অনুরাগের মুহূর্তে, যৌবনের উদ্বেল চাঞ্চল্যে, প্রৌঢ়ের বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন বিশ্লেষণের সূচীমুখে—তার সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া এগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বর্তমান শতকে ইয়োরোপকে নিয়ে যে ক'টি ভ্রমণকাহিনী লেখা হয়েছে, তার মধ্যে চারটির উল্লেখ করছি, তা থেকেই একালের বাঙালির চোখে ইয়োরোপকে প্রত্যক্ষ করব। বইগুলি হ'ল—অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' ( ১৯৩১ ), দেবেশ দাশের 'ইয়োরোপা' ( ১৯৪০ ), কুমারেশ ঘোষের 'ইংরেজের দেশে' ( ১৯৫৮ ) ও মনোজ বসুর 'নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ' (১৯৫৮ )। গ্রন্থ-চতুষ্টয়ে ১৯২৬ থেকে ১৯৫৭—তিরিশ বছরের দ্রুত-পরিবর্তমান ইয়োরোপের চলচ্ছবি দেখতে পাই। ১৯২৬-এর ইয়োরোপের সঙ্গে ১৯৪০-এর ইয়োরোপের কোনো তুলনাই হয় না; আবার ১৯৫৭-এর ইয়োরোপের কোনো পূর্বাভাস অচিন্তনীয়।

ইয়োরোপ বাঙালি তরুণের চোখে কী রূপে দেখা দেয়, প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হয়, প্রথম যৌবনের অনুরাগ-লগ্নে ইয়োরোপা প্রাণপ্রেতির প্রতিনিধিরূপে কী ভাবে আমাদের মন ভোলায়, চোখ জুড়োয়, তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন একালের অনন্যসাধারণ লেখক প্রমথ চৌধুরী ওরফে 'বীরবল'। অন্নদাশংকরের গ্রন্থের ভূমিকা-রচনাচ্ছলে 'বীরবল' বলেছেন: "প্রথম বয়সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সব তাজা থাকে, আর যখন মন বাইরের রূপ বাইরের ভাব স্বচ্ছন্দে ও

আনন্দে গ্রহণ করতে পারে, তখন ও-দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যেটা আমাদের দেশের যুবকরা সব প্রথম মনে ও প্রাণে অনুভব করে, সে হচ্ছে ও-জগতের প্রাণের লীলা। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে তারপর ইউরোপে পদার্পণ করি তখন আমারও মন এই বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেয়। শ্রীমান অন্নদাশংকরের একটি কথায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়, কারণ আমাদের লুপ্তপ্রায় পূর্বস্মৃতি সব আবার স্বরূপে দেখা দেয়—'ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই। ভারকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা'।"

বীরবল দেখিয়েছেন, ইয়োরোপের প্রাণের লীলা আসলে যৌবনের লীলা। ইয়োরোপ সম্পর্কে মুক্তমন উৎসুক কৌতূহলী বাঙালি তরুণের যে অনুরাগ, তার পরিচয় পাই অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে প্রবাসে' ও দেবেশ দাশের 'ইয়োরোপা' গ্রন্থে। বস্তুতঃ এ-দুটিকে ভ্রমণকাহিনী না বলে গদ্যকাব্য বললে ভুল হয় না। এই দুটি গ্রন্থেরই সমাপ্তি-সুর প্রিয়-মিলনান্তে মধুর বিপ্রলম্ভের সুর; সন্দেহ নেই, উভয়েই চিরতরুণী ইয়োরোপার প্রেমে পড়েছিলেন। দুটি গ্রন্থের অন্ত-পরিচ্ছেদে বিচ্ছেদের করুণ-মধুর সুরটি বেজে উঠেছে।

কিন্তু কুমারেশ ঘোষের 'ইংরেজের দেশে' ও মনোজ বসুর 'নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ' স্বতন্ত্র পটভূমিতে লেখা। সমর-বিধ্বস্ত ইয়োরোপ যেখানে নিজেকে পূর্ব-প্রতিষ্ঠায় ফিরে পেতে চাইছে, সেখানে আর ঠিক অনুরাগের সুরটি লাগে না। লেখক দুজন মধ্য-যৌবন অতিক্রম করে ইয়োরোপকে দেখেছেন, অন্নদাশংকর ও দেবেশ দাশের মতো প্রথম যৌবনে তারুণ্যের লগ্নে ইয়োরোপকে দেখেন নি।

আর সে ইয়োরোপও নেই। তাই এ-দুটি গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি ভিন্নতর। বিধ্বস্ত ইয়োরোপের উজ্জীবন-সাধনার কথা আছে, কিন্তু ভয়ংকর বিশ্বধ্বংসী সমরের চিন্তা থেকে লেখক ও পাঠক কেউ-ই মুক্ত হতে পারেন না। আরেকটি গ্রন্থের নাম করতে হয়—সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' (১৯৫১)। পারী নগরীর জীবনযাত্রার ছবি ও ফরাসি সংস্কৃতির নিপুণ আলেখ্যরূপে এই ডায়েরি-ঢঙে লেখা গ্রন্থটি একটি বিদগ্ধ মনের চিন্তার ফলশ্রুতিরূপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বীরবলের 'পূর্ব ও পশ্চিম' এবং 'আমরা ও তোমরা' রচনাদুটি ('প্রবন্ধ-সংগ্রহ') ও রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' ও 'কালান্তর' প্রবন্ধ-সংকলনে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নবীন ইয়োরোপের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ার নিপুণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সে কথাও এ'প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

বাংলা গল্পে ইয়োরোপ প্রথম এল প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'নবকথা' ও 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থে। তারপর 'বীরবল' (প্রমথ চৌধুরী)। তিনিই প্রথম আমাদের বোঝালেন, বিদেশী গল্প—বিশেষ করে ফরাসি গল্পের সংস্পর্শে না এলে বাংলা গল্পের অগ্রগতি হবে না। ফরাসি সাহিত্যের উদার জীবন-সম্ভোগনীতি ও ব্যাপক কৌতূহল তিনি বাংলা গল্পে আনতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য দুটি ফরাসি গল্পের বঙ্গানুবাদ করেন। প্রস্পার মেরিমির 'ফুলদানি'র অনুবাদ প্রকাশিত হল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'সাহিত্য' পত্রিকায়। আরো একটি গল্প 'কারমেন্'-এর অনুবাদ তিনি করেছিলেন। এ দুটি গল্পই সেদিনের বাঙালিজীবনের নীতিবোধকে আঘাত করেছিল। ঐ সময় প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্তে ও প্রেরণায় 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় এবং প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কালে 'সবুজপত্রে' বহু ফরাসি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বরদাচরণ

গুপ্ত, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

'ভারতী' গোষ্ঠীর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কান্তিচন্দ্র ঘোষ ইয়োরোপীয় কবিতার বঙ্গানুবাদে যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তেমনি বিদেশি গল্পের অনুবাদে সদ্যোক্ত লেখকরা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বসমরের সময়ে বাংলা গল্পে ইংরেজি ও ফরাসি গল্পের অনুপ্রবেশ ঘটল। 'ভারতী', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় ফরাসি গল্পের বহু অনুবাদ হল। মেরিমি, মপাসাঁ ছাড়াও গতিয়ে, য়্যুগো, বালজাক, দোদে, ড্যুমার গল্প অনূদিত হল। এই পর্বের প্রধান লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মপাসাঁর কলানৈপুণ্য তাঁর ছিল না, কিন্তু জীবনকে দেখার ভঙ্গিটি ও গল্প-উপস্থাপনার কৌশলটি প্রভাতকুমার মপাসাঁর কাছ থেকেই নিয়েছিলেন। তবে মপাসাঁর গল্পে যে তিক্ততা ও নির্মমতা আছে, প্রভাতকুমারের গল্পে তা অনুপস্থিত; তিনি জীবনের অগভীর স্তরে লঘু কৌতুকের রাজ্যে অবাধে বিচরণ করেছেন। মপাসাঁর মতই তাঁর ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

এই গুণটি প্রমথ চৌধুরীরও ছিল। 'চার-ইয়ারি কথা'য় ইয়োরোপের পটভূমিতে বাঙালি তরুণের প্রেমাভিজ্ঞতা ও তার শোচনীয় ব্যঙ্গাত্মক পরিণতি দেখিয়েছেন। তথাপি ইয়োরোপের তারুণ্য বাঙালি তরুণকে কী ভাবে প্রভাবিত করে, তার সুন্দর পরিচয় এখানে পাই।

আর মণীন্দ্রলাল বসু ইয়োরোপকে রোমান্টিক অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখেছেন, ইয়োরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তিনি তার ভক্ত। এই ভক্তি-অনুরাগের পরিচয়স্থল 'পদ্মরাগ'। ইয়োরোপের ধ্যান ও মননের দিকটি, ধরা পড়লো অন্নদাশংকরের গল্পে।

'বীরবলে'র পর বাংলা গল্পে ইয়োরোপকে আমন্ত্রণ করে আনার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকরা। ১৯২৩-২৫ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপের আদর্শে বাংলা গল্প রচনা করে 'কল্লোলে'র লেখকরা একটি নোতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করলেন। সেদিন স্কাণ্ডিনেভীয়, রুশ ও ইংরেজি গল্প প্রেরণাস্থল ছিল। ঐ সময় তরুণ বাঙালি গল্পকারের উপাস্য ছিলেন কুট হামসুন, যোহান বোর, সোমারসেট মম্, ডি. এইচ. লরেন্স, অলডাস হাক্সলি। সংস্কারমুক্তি, জীবনানুগত্য, বিজ্ঞানসত্যের জয় ঘোষণা এবং অলজ্জ অকুণ্ঠ যৌবনবন্দনা বাংলা গল্পে এল; সেইসঙ্গে এল এর দুঃখকর পরিণতি—রবীন্দ্রনাথের কথায়— 'লালসার অংসযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন'। কিন্তু এই দুঃখকর পরিণতি মুখ্য নয়, মুখ্য হল পটভূমির বিস্তার, জীবনের সীমান্ত প্রসার ও বোহিমিয়ান-অ্যাডভেঞ্চার মনোভাবের জয়ঘোষণা। 'কল্লোলে'র সাতজন গল্পকার এই কৃতিত্বের দাবীদার, তাঁরা হলেন— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, মণীশ ঘটক ('যুবনাশ্ব') ও জগদীশ গুপ্ত।

সম্প্রতিকালে সৈয়দ মুজতবা আলী, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, রঞ্জন ও দেবেশ দাশ ইয়োরোপের পটভূমিতে বা ইউরোপীয় চরিত্র নিয়ে উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেবেশ দাশের 'সেই চিরকাল', বাণী রায়ের 'পুনরাবৃত্তি' ও সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা-কাহিনীর'-র নাম করা যায়।

ইয়োরোপের পটভূমিতে বাংলা উপন্যাস লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, দিলীপকুমার রায়, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শিল্পী অন্নদাশংকর। তাঁর ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ উপন্যাস-ধারা 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২)। এই গ্রন্থে ইয়োরোপের সমগ্র

পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নায়ক বাদল সেন, প্রতিনায়ক স্থধী ও নায়িকা উজ্জয়িনী ইয়োরোপের রাষ্ট্র-সমাজ-চিন্তালোকের আবর্তে পড়েছে ও আত্মান্বেষণে বেরিয়েছে। বিশ শতকের ইয়োরোপীয় সভ্যতা এই তিনটি ভারতীয় চরিত্রের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আধুনিক মানুষের জীবনের পথান্বেষণ যে সমাপ্তিহীন, সে যে অন্বিষ্টের সন্ধানে ঘরছাড়া পথিক, সুখের মায়ায় মানুষ যে আত্মবিস্মৃত—আধুনিক মানুষের এই পরিচয়ই এই বিশাল উপন্যাসধারায় বিধৃত হয়েছে। দিলীপকুমার রায়ের 'মনের পরশ', 'বহুবল্লভ', 'দুধারা' উপন্যাসে ইয়োরোপীয় যৌবন-চাঞ্চল্যের নিপুণ আলেখ্য পাই; সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'অন্য নগর', 'এই মর্তভূমি' ও 'দূরের মিছিল' উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমের রোমান্টিক কাহিনী পাই। ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ছন্দ যতি মিল' এই ধারায় শেষতম সংযোজন।

এক শ' বছর আগে বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তথাপি ইয়োরোপ আমাদের কাছে অতি-পরিচয়ের ধূসরতায় আবৃত হয় নি। দৈনন্দিন ব্যবহারে মালিন্য-কলঙ্কিত হয় নি। ইয়োরোপ আজও বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রেরণা-উৎস। এই চিরনবীনা ইয়োরোপা 'রঙ বদলাচ্ছে, ঢঙ বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে তার মুখশ্রী।' কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অন্তরে সে সেই চিরকালের ইয়োরোপা।

# যুদ্ধ ও বাংলা উপন্যাস

বাংলা দেশে যুদ্ধ কখনোই বিশেষ আমল পায় নি। দিল্লীর তক্তে বাদ্‌শাজাদার তন্দ্রা বার বার টুটেছে, কিন্তু পল্লীমায়ের স্নেহাঞ্চল মুড়ি দিয়ে বাঙালি সুখে আলস্যে নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়েছে। সমগ্র মুসলমান-যুগের ইতিহাসই এই। ডিহিদার মামুদ-সরিফ প্রমুখের অত্যাচার বাঙালি কবির অন্তরে ছাপ ফেলতে পারে নি, কেবল তাকে উদ্বাস্তু করেছে। কিন্তু এই পর্যন্তই। যুদ্ধকে নিয়ে বাঙালি সাহিত্য রচনায় বিশেষ উৎসাহ আগে পায় নি। আসলে সুখাসীন সামন্ততান্ত্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবনে যুদ্ধের কোনো গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু—তারপর? তারপরও দেখি পলাশীর যুদ্ধ বাংলা ও সাধারণ বাঙালিকে স্পর্শ করে নি। বিজয়ী ইংরেজ সেনা যেদিন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছে (১৭৫৭), সেদিন রাস্তার দুধারে নিষ্ক্রিয় উদাসীন নিরীহ কৌতূহলী দর্শকরা দাঁড়িয়েছিল। তারা নবাবের পরাজয়ে দুঃখিত হয় নি, ইংরেজের আগমনেও দুঃখিত হয় নি। এই নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা বাঙালিকে যুদ্ধ-কাব্য-রচনার প্রেরণা থেকে দূরে রেখেছে।

ইয়োরোপের জীবনে যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়, বাঙালির জীবনে কখনোই তা বোঝায় না। মনে করা যাক্, 'Send-off' কবিতাটি। রণক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে সৈনিকদের, ষ্টেশনে তাদের জন্য ফুলের মালা আর চোখের জল, চুম্বন আর রুমাল নাড়া। তারপর যারা গেল, তারা আর ফিরবে কিনা বলা সুকঠিন। একেকটা যুদ্ধ হয়েছে, শক্ত সমর্থ তাজা জোয়ান ছেলেরা ঘর ছেড়ে যুদ্ধে গেছে, আর ফিরে আসে নি। যুদ্ধ ইয়োরোপের সমগ্র সমাজজীবনের কাঠামোটায় প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে। ফল হয়েছে দু রকম। এক, রণোন্মুখী দেশানুরাগের

অভিব্যক্তি ঘটেছে জেম্‌স টম্‌সনের 'Rule Britannia, Rule the waves'-শ্রেণীর কবিতায়—সাম্রাজ্যবাদের মদগর্বিত হুঙ্কারে। দুই, আওয়েন, ব্রুক, সাসুন, গ্রেনফেল্‌ প্রমুখ কবিদের যুদ্ধবিরোধী কবিতায়। আমাদের দেশাত্মবোধের কবিতা ও গান এই ইংরেজি গান-কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত, একথা অবশ্যস্বীকার্য। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' একটি ইংরেজ গানেরই ভাবানুবাদ মাত্র। সে গানটি এই : "From life without freedom, Oh! Who would not fly!" (Moore)।

দেশানুরাগের যে দিকটি আমাদের গানে-কবিতায় উপস্থিত, সেখানে যুদ্ধের ভাবটি প্রাধান্য লাভ করে নি। দ্বিজেন্দ্রলালের "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা"-শ্রেণীর গান বাংলায় বেশি নেই। এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের "আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি"-শ্রেণীর মাতৃরূপবন্দনামূলক দেশসংগীত।

তাই বলছিলাম, কি বাংলা দেশে, কি বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ কখনোই বিশেষ আমল পায় নি। যখন ভাবি, বিশ শতকে দুটো বড়ো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার কী ফল আমাদের সাহিত্যে রয়েছে, তখন এই জাতি-চরিত্রের কথা মনে পড়ে। ধরা যাক, এরিখ মারিয়া রেমার্কের All quiet on the Western Front নামক অমর যুদ্ধ-উপন্যাসটির কথা। ফ্লাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে জার্মান যুবকের নিষ্প্রয়োজন আত্মবলির প্রতি যে ধিক্কার ও প্রতিবাদ, এর জন্য যে বেদনা ও কারুণ্য এই উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে, তার কি কোথাও তুলনা মিলবে! যেদিন সন্ধি হল, সেদিন পশ্চিম রণাঙ্গনে অখণ্ড শান্তি, মৃতদেহ ও মর্টারশেলে আকীর্ণ রণাঙ্গনে সেদিন কেবল একটি প্রজাপতির গতিচাঞ্চল্য, আর সবই নিস্তব্ধ, মৃতের শান্তিতে শায়িত। এই বর্ণনায় যে বেদনা, তা জীবনের গভীর থেকে উৎসারিত।

যুদ্ধ কী ভাবে দেশবিদেশের মনীষাকে আলোড়িত করেছে এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে, তার সামান্য হিসেব নেওয়া যাক। এই হিসেব নিতে গেলে একটা কথা বড় হয়ে ওঠে। তা হ'ল একেকটি বড় যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মহৎ যুদ্ধ-উপন্যাসের সৃষ্টি হয় নি। তারপর অপেক্ষা করতে হয়েছে; দশ, পনের, বিশ এমন কি পঞ্চাশ বছর পরেও তার সৃষ্টি হয়েছে।

টলষ্টয় 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' নামক মহৎ উপন্যাসটি রচনা করেন নাপোলিয়ঁর পতনের পঞ্চাশ বছর পরে। কিশোর টলষ্টয় এই যুদ্ধের এক নওজোয়ান ছিলেন, তারপর জীবনতরঙ্গে নানা ঘাটে ভেসে বেড়াবার পর তিনি এই মহৎ কর্মে হাত দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দশ বছর পরে যুদ্ধ-নাট্য 'জার্নি'জ্ এণ্ড' প্রথম অভিনীত হয়। মহামতি লিঙ্কনের মৃত্যু ও যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের বহু পরে তা নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ড্রিংকওয়াটারের 'আব্রাহাম লিঙ্কন' নাটক তো এই শতকের লেখা। এই অবসর, ব্যবধান, দূরত্ব হয়ত প্রয়োজন স্থিতিলাভের জন্য, লেখকের মনে ধ্যানের প্রশান্তি আনবার জন্য। কিন্তু তা ছাড়াও আরো একটি কারণ বড় বলে আমার মনে হয়। তা হ'ল এইসব গৃহযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ ইয়োরোপীয় যুদ্ধ রাষ্ট্রজীবন ও সমাজজীবনের মূলে এত গভীর আঘাত করেছে যে তাকে সামলাতে বহু বছর লেগেছে। কেবল সমাজজীবনের স্থিতি ও শান্তি নষ্ট হয় নি, তার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইয়োরোপের সঙ্গে কি 'তিরিশের' যুগের ইয়োরোপের কোন মিল আছে? অথবা, বিশ শতকের প্রথম দশকের ইয়োরোপের সঙ্গে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের কোন মিল ছিল? মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধের অভাব ও বিনাশ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। তার জন্যই লেখকেরা সময় নিয়েছেন, দশ-বিশ-পঞ্চাশ বছরের দূরত্বে যাবার পর নোতুন করে জীবনের নব মূল্যায়ন করেছেন।

অন্যথায় সেই সর্বহারা নৈরাশ্য, বেদনা, অবসাদ ও শূন্যতার মাঝে তাঁরা কিসের বাণী শোনাবেন? যখন মানুষের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায় সেদিন তার আর কিছুই থাকে না। সেই দুর্দিনে কোনো সাহিত্য সৃষ্টিই সম্ভবপর নয়। যেদিন নোতুন মূল্যবোধের আশায় মানুষ পুনর্বার উজ্জীবিত হয়, সেইদিনই সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। উপন্যাস, গল্প, নাটক্, কবিতা, স্মৃতিগ্রন্থ, ইতিহাস, প্রবন্ধ: সবই লেখা হয়েছে। আর সবই লেখা হয়েছে সময়ের দূরত্বে—বেদনার উপত্যকা পেরিয়ে এসে শান্ত পর্যালোচনার মালভূমিতে পৌঁছবার পর। কয়েকটি বইয়ের নাম করা যেতে পারে: All quiet on the Western Front, Le Feu, The Spanish Farm (trilogy), Memoirs of a Foxhunting Man, Memoirs of an Infantry Officer, The Whistlers' Room, The case of Sergeant Grischa, The Good Soldier Schweik, Journey's End। ব্যক্তি-মানুষের উপর যুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রচণ্ড প্রভাব এই সব গ্রন্থে ভাষারূপ লাভ করেছে। মানুষের জীবনকে এত গভীর ভাবে এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রভাবিত করেছে, যা সভ্যতার ইতিহাসে পূর্বেকার সমস্ত যুদ্ধবিভীষিকাকে ছাড়িয়ে গেছে। এই যুদ্ধের পটভূমিতে লিখিত হয়েছে হেমিংওয়ের The Sun Also Rises ও A Farewell to Arms। আর স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে হেমিংওয়ে লিখলেন For Whom the Bell Tolls। এই তিনটি উপন্যাসই যুদ্ধের বিপক্ষে রচিত। বাংলা সাহিত্যের স্বপক্ষে একটা কথা বলা যেতে পারে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমাদের ঘরের মধ্যে এসে পড়ে নি, আমাদের সমাজজীবনকে তা নাড়া দেয় নি, ভেঙে দেয় নি। আর এ কথাও সত্যি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভে সেদিনের ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় খুশি হয়েছিলেন, স্বয়ং গান্ধীজী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য 'কাইজার-ই-হিন্দ'

পদক পেয়েছিলেন। ইংরেজের সৎবুদ্ধির উপর সেদিন আমাদের আস্থা অটুট ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের ঘরের আঙ্গিনায় এসে পৌঁছল। তাকে আর অস্বীকার করা গেল না। মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ ভারতে—বিশেষ করে আসামে ও বাংলা দেশের ঘাড়ে এসে পড়ল। আমাদের সুখী স্বচ্ছল শান্ত জীবনযাত্রার উপর কালো ছায়া ফেলে বিশ্বযুদ্ধ দুয়ারে এসে দাঁড়াল। সেদিন তাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমাদের ছিল না। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধের অংশীদার হতে হয়েছিল। জাপানি-বোমার অভিজ্ঞতা যেদিন বাংলা দেশ প্রথম পেল, সেদিনটি বাঙালির জীবনে অবিস্মরণীয় দিন। এতদিন যাকে দূর থেকে দেখেছি, কানে শুনেছি মৃত্যুনাদ, পড়েছি রণজয়গাথা, আজ সে আমাদেরই ঘরে এসে পড়েছে। বাংলা গল্প উপন্যাসে তাই ডিসেম্বর ১৯৪১-এর রাতগুলি ঠাঁই লাভ করেছে। সেদিনের সকল বাঙালির লেখাতেই এই জাপানি আক্রমণের পরিচয় রয়েছে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ নয়, পরোক্ষ রূপটিই সেদিনের বাংলা সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, নিষ্প্রদীপের মহড়া, বিমান আক্রমণ-প্রতিরোধ, বিফল-প্রাচীর, ট্রেঞ্চ, সাইরেন, কন্ট্রোল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, জনযুদ্ধের বুলি, ইংরেজের মিথ্যা প্রচার, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান সংকট : এ সবই সেদিনের বাঙালিকে ঘিরে ধরেছিল। বাংলা দেশের বুকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যসমাবেশ এবং তারই আনুষঙ্গিক ফল—সমাজজীবনে শৈথিল্য, অনাচার, পতিতাবৃত্তির প্রসার, কালোবাজারির গোপন সুরঙ্গপথে বাণিজ্য, ঘুষ, চোরাকারবার, ও ভারত রক্ষা আইনের দাপটে সেদিনের বাঙালি অভ্যস্ত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধের এই পরোক্ষ রূপটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেদিন রণক্ষেত্র আমাদের সীমান্তে, রণতাণ্ডব আমাদের আঙ্গিনায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইয়োরোপকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আজো ইয়োরোপ তার প্রচণ্ড ক্ষতি সামলে উঠতে পারে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা ব্যাপকতর ও গভীরতর, ভয়ংকর ও সর্বনাশারূপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইয়োরোপে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য, সাহিত্যে এর প্রতিফল হয়েছে ভিন্নতর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিকতা ইয়োরোপীয় কবিকণ্ঠে ধ্বনিত করে তুলেছিল ক্রোধ ও ঘৃণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ধ্বনিত করেছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও নৈরাশ্য। কেননা, ১৯৩৯-এর অনেক পূর্বেই সমস্ত ইউরোপ মনে মনে তৈরি ছিল এবং আগামী যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই এতে আদর্শভঙ্গের বেদনা ও বিস্ময় ছিল না, ছিল আদর্শবিচ্যুতির হতাশা ও ক্ষোভ। বরং বিপরীত মনোভাবেরই সৃষ্টি করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যতটা সর্বগ্রাসী সমূহ ক্ষতি ও সর্বনাশের আশাংকা ছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। হিরোশিমা-নাগাসাকির কথা বাদ দিলে মানুষের সমূহ বিনাশ ঘটে নি বল্লেই চলে। লণ্ডন শহর দীর্ঘ পাঁচ বছর জর্মান বোমারু বিমানের আক্রমণ সহ্য করে আপন জীবনযাত্রা চালিয়েছে; মস্কো নগরী অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাত্রা কখনো বন্ধ করে নি, পরাজিত সিঙ্গাপুর দুদিনেই সামলে নিয়ে নোতুন শাসনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। আসলে ক্ষতিটা হয়েছে নীতিবোধ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। মানুষের সমস্ত শুভবুদ্ধি ও মহৎ প্রেরণার শোচনীয় পরাজয় বড় ক্ষতি হয়ে উঠেছে। ফ্লাণ্ডার্সের কর্দমাক্ত রণভূমি, সোম্-এর রক্তাক্ত বিভীষিকা বা পাশেন্-ডেলের মৃত্যুতাণ্ডবের পুনরভিনয় এবার বিশেষ হয় নি, কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মূলতঃ যান্ত্রিক যুদ্ধ—তাকে বিশিষ্ট রণকলায় পরিণত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষের নোতুন অভিজ্ঞতা ঃ আণবিক বোমা এবং হিরোশিমা-নাগাসাকির সার্বিক ধ্বংস। এ ছাড়া সবই কিছু কিছু জানা ছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরো-আমেরিকান্ সাহিত্যকে তেমন করে নাড়া দিতে পারেনি। তাই 'ওঅর এণ্ড পীস্'-এর মতো

মহৎ উপন্যাস বা 'অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'-এর মতো তীব্র প্রতিবাদমুখর উপন্যাস এবার লিখিত হয় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরো-আমেরিকান সাহিত্যের ঝোঁকটা তাই পড়েছে রণতাণ্ডব বা যুদ্ধের সর্বনাশা ভয়াবহ রূপচিত্রণের উপর নয়, জনতার সংগ্রামী চেতনা ও অপূর্ব প্রতিরোধমূলক শৌর্যবীর্যের উপর। সেইজন্যই আমরা পেয়েছি 'ফল অফ পারী' ( এলিয়া এরেনবুর্গ )— জর্মান আক্রমণের সামনে পরাজিত পারীর প্রতিরোধ, পেয়েছি সার্ত্র-র প্রতিরোধ আন্দোলনের উপন্যাস 'উইনডো', পেয়েছি হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমানুপ্রাণিত সোভিয়েৎ ভূমির অপূর্ব প্রতিরোধকাহিনী কোজিয়েভের 'ষ্টালিনগ্রাড', ভান্দা ভাসিলিয়ে-ভস্কার 'রেইনবো', পেয়েছি 'সীম'। এগুলির মূল বক্তব্য ও সুর এক।

কিন্তু বাংলা দেশে ও সাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই প্রথম ঘরের আঙ্গিনায় যুদ্ধ। এবং তার পরোক্ষ ফলভোগ বাংলা দেশ সবচেয়ে বেশি করেছে, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। প্রত্যক্ষ বর্ণনা থেকে আমরা বঞ্চিত, কেননা যুদ্ধ বাংলার মাটিতে হয় নি, যা হয়েছে তা জাপ বোমারু বিমাণের আক্রমণ। একটা সুবর্ণ সুযোগ বাঙালি লেখকরা নষ্ট করেছেন। তা আসাম-সীমান্তে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক সংগ্রাম। আজ পর্যন্ত মাত্র একজন বাঙালি লেখক এই উপাদান ব্যবহার করেছেন, তিনি শ্রীদেবেশ দাস। তাঁর 'রক্তরাগ' উপন্যাসের সম্পূর্ণ পরিবেশ এই সমরকাহিনীতে আচ্ছন্ন। এর জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতার ফল বাংলায় একটিমাত্র; তা শ্রীবরেন বসুর 'রঙরুট', বাঙালি সেনাশিবিরে ইংরেজ অধিনায়কের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ এর মূল কথা। যাঁরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ এলাকার মধ্যে আটকা পড়েছিলেন, তাঁরাই বরং যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছেন স্মৃতিগ্রন্থে; যেমন শ্রীমতী নিরুপমা দত্তের 'সিঙ্গাপুর', শ্রীমতী মানসী

মুখোপাধ্যায়ের 'বিদায় বর্মা'। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর স্মৃতিগ্রন্থ সাহিত্যিক উৎকর্ষ লাভ করে নি, কারণ এঁরা জাত-লিখিয়ে নন। বাংলা দেশে—কলকাতায় যুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিফলের বর্ণনা অনেকের লেখায় পাই, তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত, শ্রীনবেন্দু ঘোষ, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীরমাপদ চৌধুরী এই শ্রেণীর গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে নাম করতে পারি 'কালো ঘোড়া' ( সরোজকুমার ), 'ভুলি নাই' ( মনোজ বসু ), 'মন্বন্তর' ( তারাশঙ্কর ), 'কালো রাত' ( ভবানী মুখোপাধ্যায় ), 'উপনিবেশ'-৩য় খণ্ড ( নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)। বোধ করি 'মন্বন্তর' এই শ্রেণীর লেখার প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস। জাপানী বিমান আক্রমণে বিপর্যস্ত কলকাতা এবং যুদ্ধের ছায়াতলে মানবিক মূল্যবোধের পরাজয়ে বিষণ্ণ বাঙালিজীবনের সার্থক প্রতিফলন এই উপন্যাস। "দামামা ঐ বাজে, দিন-বদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে", এই বাণীই 'মন্বন্তরে'র মূল সুর। আরেকজনের লেখায় যুদ্ধের নোতুন রূপ পাই বর্মার রণক্ষেত্রে। "ইরাবতী" ও "আরাকান" উপন্যাসে শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় জাপানী আক্রমণে পরাজিত বর্মার প্রতিরোধ আন্দোলন ও বর্মী-বাঙালির যুগ্ম প্রতিরোধের বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন। এই দুটি উপন্যাসে তিনি বাংলা উপন্যাসের ভূগোলকে প্রসারিত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত রেঙ্গুন শহরের বুকে প্রতিরোধ-আন্দোলনের কথা শুনিয়ে নোতুনের স্বাদ এনেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো পর্যন্ত "ওআর এণ্ড পীস্"-এর মতো মহৎ উপন্যাসের জন্মদাতা হতে পারে নি। জানিনা ইউরোপ সে গৌরবের অধিকারী হবে কিনা। জানিনা ইলিয়া এরেনবুর্গ বা আর্ণেস্ট হেমিংওয়ে সে গৌরবের অংশীদার হবেন কিনা। তবে বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ মহৎ কীর্তি রেখে যায় নি, একথা মেনে নিতে হয়।

# বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

ঈশ্বর এক ছিলেন, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—বহু হতে চাই। বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি এই অভিলাষ থেকে। উপন্যাস-বিধাতার অভিলাষ থেকেও মানবজীবনের বহু বিচিত্র রূপের সৃষ্টি। কেবল নিজের কালের কথা নয়, নিজের দেশের ছবি নয়, চেনা মুখের ছবি নয়, দূর কালের ও দেশের, অচেনা মানুষ ও পরিবেশের চিত্রাঙ্কনে তিনি স্বভাবতই আগ্রহী। এই আগ্রহ আর অভিলাষ থেকেই আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম।

কিন্তু প্রথমেই আপত্তি উঠবে, রচনা মাত্রেই কি আঞ্চলিক নয়, বিশেষ দেশ-কাল-গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়? এক দেশ বা অঞ্চলের ভাষা যখন অপর দেশ বা অঞ্চলের পক্ষে বোধগম্য নয়, তখন এক দেশের সাহিত্য অপর দেশের কাছে আঞ্চলিক সাহিত্য নয় কি? এই-ভাবে দেখলে সব সাহিত্যই আঞ্চলিক সাহিত্য; এমন-কি একই ভাষার উপভাষায় লিখিত সাহিত্য সে-উপভাষার দুর্বোধ্যতার জন্য অপর অঞ্চলে আঞ্চলিক সাহিত্য বলে ধার্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, উপভাষার উপর দখলের হিসেবে আমার কাছে হয়ত 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বা 'গঙ্গা' বোধগম্য, আর 'পূর্বপার্বতী' বা 'পদ্মানদীর মাঝি' বোধগম্য নয়, তার ফলে প্রথম দুটিতে আমার মন ছাড়া পায়, শেষ দুটিতে হয়ত বাধা পায়।

কিন্তু, না, এভাবে এগোলে সত্যকে পাবো না। সাধারণত আঞ্চলিক ভাষা, প্রকাশবাহন ও ভঙ্গীর জন্যই কোনো বিশেষ গল্প বা উপন্যাস আঞ্চলিকতার সীমা-অবরুদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু তার প্রবৃত্তি, ধর্ম, আকাঙ্ক্ষা, গুণ, আনন্দবেদনাবোধের সর্বজনীনতা তাকে দূরে থাকতে

দেয় না, কাছে টেনে আনে। এইজন্য শতযোজন দূরবর্তী ও সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও ফকনার, থিওডোর ড্রেজার, আপটন সিনক্লেয়ার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, সোমারসেট মম্-এর উপন্যাস উপভোগে বাধার সৃষ্টি হয় না। অন্যথায় এদের উপন্যাস আমরা কেবল পাঠ করতাম, উপভোগ করতাম না। তাই পাঠক কোন্ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠেছেন, তার উপর অপর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত উপন্যাস-পাঠে বাধা জন্মায় না।

এই সমস্যা নিয়ে নানা চিন্তা বিদেশী মনীষীরা করেছেন ও বিভিন্ন মতেরও জন্ম হয়েছে। এখানে দুটি মতবাদের উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটির নাম, জিও-পোলিটিক্যাল বা 'ভূ-রাজনীতিক' মতবাদ, দ্বিতীয়টির নাম 'একোলজি' বা বাস্তুসংস্থান মতবাদ। দু মাইল ব্যবধানে কথার ভঙ্গী, দশ মাইল ব্যবধানে কথ্যভাষা, পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানে পোষাক-আচার-ব্যবহার, একশ' মাইল ব্যবধানে লৌকিক বিশ্বাস, হাজার মাইল ব্যবধানে মানসিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটে বলে বিদেশী সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন। আবার নদী, মরুভূমি, পাহাড়, ঋতুবৈশিষ্ট্য বা ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপরে মানুষের কেবল আচার-ব্যবহার নয়, ধ্যানধারণাও নির্ভরশীল বলে অনেকে মনে করেন। তাই বীরভূমের চাষী ও সুন্দরবনের চাষীর সব কিছুই এক হতে পারে না, কিন্তু মানসিক পটভূমি অপরিবর্তিত থাকার জন্য ধ্যান-ধারণা বিশেষ বদলায় না। তথাপি বনবিবি ও সত্যপীরের উপাসক ('জলজঙ্গল' : মনোজ বসু) এবং 'বাবা কালারুদ্দুরে'র উপাসক চাষী ('হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়) একই মানসিকতার অন্তর্ভুক্ত—এ'কথা বলা যাবে না।

উপন্যাসে আঞ্চলিকতা বললে আমরা সত্যসত্য কি বুঝি, তা আলোচনা করা যেতে পারে। 'লোকাল কালার', স্থানিক রঙ কি উপভাষায়, আহার-বিহারের বিশেষ স্বতন্ত্র পরিচয়ে ও লৌকিক-

পারলৌকিক বিশ্বাসের বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল? কেবল এই-ই যদি থাকে, তবে তাকে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি বলা যাবে না। বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতি সীমাবদ্ধ অথচ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাতেই কি একটি সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়? কারুকুশলতা, যা স্থানিক রঙ ফোটাতে প্রকাশ পায়, তা-ই কি আঞ্চলিক ঔপন্যাসিকের মূলধন? না কি ব্যাপক বিস্তীর্ণ গভীর অভিজ্ঞতাই সব? অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে অনেক উপাদান জমা হয়েছে, অথচ সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় লেখক ব্যর্থকাম হয়েছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। জীবনের পথে উত্তেজনা-রস পানের নেশায়—অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়—লেখক যদি ছুটে বেড়ান, তাহলেই তিনি সার্থক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধকাম হবেন, আর, যিনি ঘর থেকে, নিজের পরিচিত ভূখণ্ড থেকে বাইরে যান নি, তিনি ব্যর্থকাম হবেন, এটাই কি সত্য? না, তাও নয়।

আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার সার্থকতায় এ'সবই উপাদান মাত্র, সিদ্ধি নয়। সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন গভীর ব্যাপক জীবনবোধ—যা কেউ কাউকে দিতে পারে না; তা চুরি করা যায় না; তা জীবনের মূল্যে অর্জন করতে হয়।

বাংলায় যদি 'আঞ্চলিকতা' শব্দটিকে শিথিলভাবে ব্যবহার করি, তবে অনেক লেখাই 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অভিধায় ভূষিত হতে পারে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, প্রফুল্ল রায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের

উপন্যাসে বঙ্গভূমি ও বঙ্গেতর ভূমির জীবনের বিচিত্র স্বাদ পাই। কিন্তু সংশয় এই যে, স্থানিক রঙ বা আঞ্চলিক ভাষা থাকলেই কোনো উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস বলে পরিগণিত হবে কি না ?

বাংলা উপন্যাস অদ্যাবধি নগর ও গ্রামের নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। ফলে স্বভাবতই তা সংকীর্ণ, বৈচিত্র্যহীন, স্বাদহীন। এই মরা জীবনের স্রোতে অপরিচিত জীবনের লবণস্বাদ ও জীবনোপভোগের তীব্র পিপাসা বহন করে এনেছে সদ্যোক্ত লেখকদের উপন্যাসনিচয়। সে-কারণে এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প—'সমুদ্রের স্বাদ'--এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানী ঘরের একটি ছোট মেয়ের সাধ হয়েছিল পুরী যাবে, সমুদ্র দেখবে। কিন্তু যাওয়া হল না, কারণটা বলা বাহুল্য মাত্র --অর্থাভাব। দরিদ্র পিতার মেয়েকে তাই আশাভঙ্গের বেদনায় কেঁদে কেঁদে অশ্রু ঝরাতে হল। কিছুদিন পরে মেয়েটি মারা গেল। তখন অক্ষম দরিদ্র পিতা এই কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে চাইল—মেয়ে লবণাক্ত অশ্রুতে লবণাক্ত সমুদ্রের স্বাদ পেয়েছে। আমাদেরও তাই ; এই বঞ্চিত রিক্ত সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনে এই আঞ্চলিক উপন্যাস সমুদ্রের স্বাদ, সুদূরের স্বপ্ন, জীবন-ভোগের আমন্ত্রণ বহন করে এনেছে।

আঞ্চলিক উপন্যাসের সিদ্ধি কোথায় লুকিয়ে আছে—এই প্রশ্নটিকে এখন গভীরভাবে বিচার করা যেতে পারে।

আগেই বলেছি, অভিজ্ঞতা চাই, স্থানিক রঙ ফোটানোর কারু-কুশলতা চাই, আঞ্চলিক ভাষার উপর দখল চাই। কিন্তু এগুলি উপাদান মাত্র, আসলে চাই গভীর জীবনবোধ। নোতুন মানুষ, নোতুন দেশ, নোতুন ধ্যানধারণা, নোতুন মানসিকতা—সব মিলিয়ে একটী অখণ্ড জগৎ গড়ে তোলার উপযুক্ত জীবনবোধ। এ ছাড়া

কোনো লেখাই সার্থক নয়, কোনো ঔপন্যাসিকই জীবনশিল্পী নন। হার্ডির 'দি রিটার্ণ অফ দি নেটিভ' উপন্যাসে এগডন হীথের রুক্ষ ভয়াল প্রান্তর তার ভয়াল বিস্তার নিয়ে ওয়েসেক্স অঞ্চলের বিশিষ্ট বাতাবরণ গড়ে তুলেছে এবং তার উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ, যা পাঠককেও ভাবায়, তাকে চিন্তার নোতুন ভূমিতে উত্তীর্ণ করে। এই জীবনবোধ ও নবজন্মের মুহূর্ত যে উপন্যাসে দেখা যাবে, সেই উপন্যাসই সার্থক, এ-কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই। আর যদি এই গভীর জীবনবোধের প্রত্যাশা না করি, তবে বহু সংবাদধর্মী বিবরণ বা রম্য-কাহিনীকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মনে করব। সেই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্যই আঞ্চলিক উপন্যাস-পাঠকের এই আত্মজিজ্ঞাসা ও নির্মোহ বিশ্লেষণ। একে বাদ দিলে পাঠক হিসেবে আমি ফাঁকে পড়ব, এবং সম্ভবত, প্রশংসাচ্ছলে লেখককেও ফাঁকি দেব।

# সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস-চিন্তা

গত দশ বছরে বাংলা উপন্যাসের যে জনপ্রিয়তা ও প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা নিয়ে চিন্তার খোরাক জুটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র যে সময় উপন্যাস লিখতেন, আমরা তার থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়েছে, তাছাড়া অর্থনৈতিক পটও পরিবর্তিত হচ্ছে। অধুনা আমরা এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি, যে সময় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অতি দ্রুত আসছে ও চলে যাচ্ছে, স্থির হয়ে উপভোগ বা চিন্তার অবকাশ নেই। আবার যে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের উপর আমাদের আস্থা ছিল তা-ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উচ্চ স্তরের সৃষ্টিকর্মের জন্য যে ধ্যানের অবসর ও কর্মবিরতি একান্ত প্রয়োজন, তা আজ সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ত-তর হয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার লক্ষণ কি, এই প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিশ্বকে নির্বিকারচিত্তে তদ্‌গতভাবে দেখাই যথার্থ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে এর সমর্থন পাওয়া যায় কি?

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ—এই বিশ বছরে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার পট পরিবর্তিত হয়েছে, বিজ্ঞান-গবেষণার অবিশ্বাস্য উন্নতি ঘটেছে, মনের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য পতন ঘটেছে। এই বিপুল গভীর সর্বগ্রাসী পরিবর্তন বাংলা উপন্যাসকে কতটা প্রভাবিত করেছে, সে সম্পর্কে খানিকটা চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে,' শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ,' বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ঠিক এই পর্বের অব্যবহিত পূর্বে রচিত উপন্যাসের তিনটি স্থায়ী কীর্তি। প্রথম দুটিতে আধুনিক সমাজে নর-নারীর জটিল

সম্পর্কের নিপুণ বিশ্লেষণ, তৃতীয়টিতে প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের আলেখ্য চিত্রণ। 'ঘরে বাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাসের পিছনে রয়েছে মননশীল, পর্যবেক্ষণ-নিপুণ, বিজ্ঞানী মন। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের পিছনে আছে অভিজ্ঞতার সততা ও সমস্ত বিশ্লেষণের উপর জয়লাভকারী প্রকৃতিপ্রেমী কবিমানস।

তারপর থেকেই বাংলা উপন্যাসে নিশ্চিন্ত ধ্যানের দিন শেষ হয়েছে। বাংলাদেশের জীবন ধীরে ধীরে নয়, অতি দ্রুত নানা সংকটাবর্তে পড়েছে এবং এক সংকট থেকে মুক্তি পেয়ে অপর সংকটে গিয়ে পড়েছে। আমাদের মনের বয়স বেড়েছে। জাতীয় ও ব্যক্তি-জীবনে আমাদের গতিবেগ বেড়ে ।গয়েছে।

আধুনিক উপন্যাস বলতে যে কথা মনে হয়, তা হ'ল—অধুনা উপন্যাস আর অবসর বিনোদনের জন্য বা রমণীমোহন সুখপাঠ্য কাহিনী পরিবেশনের জন্য লিখিত হয় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে এ কথার সমর্থন মেলে। টমাস মান, আঁদ্রে মোরোয়া, জেমস জয়স, মার্সেল প্রুস্ত, ফ্রানৎজ কাফকা, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, লাক্‌স্‌নেস, অলব্যের কামু, সাত্র, বরিস পাস্তেরনাকঃ এই দশজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের ধারক ও বাহক। এরা যে-ভাবে জীবনকে দেখেছেন, তা ঐ রবীন্দ্র-কথিত আধুনিক দৃষ্টিতে —বিশ্বকে নির্বিকারচিত্তে তদ্‌গতভাবে দেখেছেন। এর পিছনে উনিশ শতকের মহৎ উত্তরাধিকার-সূত্রটি রয়েছেঃ ডস্টয়েভস্কি, তুর্গেনিয়েফ, টলষ্টয়, স্তাঁদাল, বালজাক, ফ্লোবেঅর। এযুগের মানবসমাজের মহাকাব্য হল উপন্যাস, তাতে ধরা পড়েছে এ যুগের সমস্ত চিত্তবিক্ষোভ, সংশয়, বেদনা, নৈরাশ্য, আনন্দ; দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, শিল্পশাস্ত্র, বিজ্ঞান, নৈতিক সমস্যা—যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ একালের উপন্যাসে পাই। উপন্যাস তাই সর্বগ্রাসী শিল্পকীর্তি, এর কাছে আর সবই নিষ্প্রভ। বিজ্ঞান ও

দর্শনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করে কাহিনীর মাধ্যমে জীবন-রসে রসায়িত করে ঔপন্যাসিক মানবসমাজের বিচিত্র আলেখ্য অংকন করেন। তাই এ'কালের সার্থক প্রতিনিধি ঔপন্যাসিক এবং একালের সার্থক শিল্পকর্ম উপন্যাস। কেবল মহৎ ব্যাপ্ত কল্পনা নয়, গভীর মননশীলতা ও তীব্র জিজ্ঞাসা আধুনিক উপন্যাসে অবশ্যই থাকবে।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস এই প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের আলোচনায় আমরা উপকৃত হব বলেই আমার বিশ্বাস। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসগুলি গভীরভাবে পড়লে দেখা যায় অল্পসংখ্যক উপন্যাসই সত্যিকারের মননচিন্তার আলোকে পরিশুদ্ধ জীবন-ভাষ্য, বেশিরভাগই কাহিনী মাত্র। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, একালের বাঙালি ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশই কাহিনীকার, জীবন-শিল্পী নন। কথাটা রূঢ় মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য। মানি, কাহিনী ও চরিত্র, হৃদয়াবেগ ও ঘটনাপ্রবাহ ছাড়া উপন্যাস হয় না। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস আর শিশুপাঠ্য নয়, শিশুমনস্ক বয়স্ক পাঠকের ভোগ্য নয়, রূপকথা বা রোমান্স মাত্র নয়। আধুনিক উপন্যাস অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী মননপ্রধান তত্ত্বজিজ্ঞাসু পরিণত শিল্পকীর্তি। উপরে যে দশজন আধুনিক পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকের নাম উল্লেখ করেছি, তাঁরা সবাই এই অর্থে পরিণত শিল্পকীর্তির নির্মাতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে যে ক'জন শক্তিশালী বাঙালি ঔপন্যাসিকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, তাঁদের মাত্র কয়েক জনই এই পরিণত দার্শনিক মননের ও জীবনজিজ্ঞাসার অধিকারী।

স্বল্পসংখ্যক লেখক জীবনজিজ্ঞাসায় কৌতুহলী উপন্যাস রচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে অনেক কুশলী কাহিনীকার ছিলেন ও আছেন, কিন্তু তাঁরা নানা অভিনব পটভূমিতে জীবনের বৈচিত্র্য সন্ধানে যত তৎপর, মানবমনের গূঢ় সমস্যা বা একটি যুগের পটভূমিতে একটি জাতির আত্মার স্বরূপ সন্ধানে তত তৎপর নন।

এ'কথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না, নব নব ভৌগোলিক পরিবেশে বা দূর-অতীত ও নিকট-অতীতে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ, রোমান্স ও উৎকেন্দ্রিক কল্পনার চিত্রাংকনে সদাতৎপর কুশলী কাহিনীকারবৃন্দ বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছেন, গভীরতা আনতে সক্ষম হন নি। কামু বা সাত্র, পাস্তেরনাক বা মান যেভাবে জীবনকে দেখেছেন সেভাবে সাম্প্রতিক বাঙালি ঔপন্যাসিকরা জীবনকে দেখছেন না। বিশাল পটভূমির অনুপস্থিতি আমাদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, একথাই স্বীকার্য।

ভিক্টর য়্যুগোর উপন্যাসে ফরাসি বিপ্লব, টলষ্টয়ের উপন্যাসে নাপোলীআঁনিক যুদ্ধ, পাস্তেরনাকের উপন্যাসে রুশ বিপ্লবের সম্পূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ, এরেনবুর্গের উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহাদেশ-ব্যাপী বিস্তৃত সমরাভিযান-স্রোত, অথবা হেমিংওয়ের উপন্যাসে সমুদ্রের নির্জন রহস্যময়তা, মানের উপন্যাসে বংশগতি ও ব্যক্তি-স্বভাবের বিরোধের তীব্রতা, কামুর উপন্যাসে বর্তমানের নির্মম বিশ্লেষণের গভীরতা যেভাবে আমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে, সেভাবে হালের বাংলা উপন্যাস আমাদের প্রভাবিত করে না। এবং তার কারণ গভীর বিশ্লেষণক্ষমতা ও জীবন-জিজ্ঞাসার অভাব।

আরো একভাবে একালের বাংলা উপন্যাসকে দেখা যেতে পারে। উপন্যাসের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সর্বজনীন আবেদনের পিছনে অবশ্যই গল্পের মোহ আছে। কিন্তু গল্পসর্বস্বতার জোরে কোনো উপন্যাসই উৎকর্ষ অর্জন করে না, করতে পারে না।

উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে মূলত তিনটি লক্ষণের উপর। এর মধ্যে যে কোনো একটির উপস্থিতি উপন্যাসকে স্থায়িত্ব দিতে পারে। প্রথমতঃ, মানবজীবন-রহস্যের নোতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটনের উপরে স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ, পরিচিত সত্যের স্মরণীয় উপস্থাপন তথা স্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ কোনো উপন্যাসকে উৎকর্ষ দিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, প্রবহমান জীবনস্রোতের ও সমাজের গভীর দ্যোতনা সৃষ্টিতে ও সমাজপ্রাণের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের উপর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

'পথের পাঁচালী'তে যে গভীর জীবনসত্যের আভাস আছে, তা একালের বাংলা উপন্যাসে বিশেষ পাই না। আবার 'গৃহদাহ', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা,' 'যোগাযোগ' উপন্যাসে যে ব্যাপকতর পটভূমিতে জীবনালেখ্য অংকিত হয়েছে ও উদার জীবনদর্শনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, অধুনা তা খুব সুলভ নয়। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', বা সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসে এই ধরণের যুগসত্য তথা মানবসত্যের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সফল সৃষ্টির সংখ্যা অঙ্গুলি-গণনীয়। অন্নদাশংকর রায়ের 'সত্যাসত্য' উপন্যাসধারায় যে তত্ত্বকেন্দ্রিক গভীর জিজ্ঞাসু মনের সাক্ষাৎ পাই, তাও অধুনা সুলভদর্শন নয়। আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিবারাত্রির কাব্য', 'জননী', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' উপন্যাসে সমাজপ্রাণের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও বাহ্য ব্যবহারের অন্তরালে ক্রিয়াশীল মানবমনের নির্মম বিশ্লেষণে যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তাও খুব সুলভ নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বহু স্মরণীয় চরিত্রের দেখা মেলে। তারা আমাদের নিত্যকর্মের ও ভাবনার সঙ্গী। তারা আমাদের মানসক্ষেত্রে জীবন্ত রূপে বর্তমান। স্মরণীয় চরিত্রগুলির আনন্দ-বেদনা আমাদেরই আনন্দ-বেদনা বলে মনে হয়। আমরা অনায়াসেই কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, নবকুমার বা শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখরের কথা ভাবতে পারি; অল্পায়াসে স্মরণ করতে পারি সূর্যমুখী, হীরা, কুন্দকে; গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণীকে। আমরা অনায়াসেই বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ, পরেশবাবু, গোরা, সুচরিতা,

কুমুদিনী, অমিত, লাবণ্য প্রভৃতিকে স্মরণে আনতে পারি। আবার অচলা, সুরেশ, মহিম, রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত, সাবিত্রী, অভয়া, রাসবিহারী, ষোড়শী, জীবানন্দের কথা ভাবতে পারি। এইসব চরিত্র আমাদের এত পরিচিত, স্মরণপথে এত উজ্জ্বল হয়ে আছে, নিত্য ব্যবহারে আমরা এদের উল্লেখ করতে থাকি। পরিচিত সত্যের স্মরণীয় উপস্থাপনে ও স্মরণীয় চরিত্র-চিত্রণেই কেবল নয়, অস্তিত্বের জিজ্ঞাসার শিল্পরূপায়ণের ও গভীর জীবনরহস্যস্রোতের ক্ষণমুহূর্তের উপর চিরস্থায়িত্ব আরোপের ক্ষমতাও এই তিনজন ঔপন্যাসিকের ছিল। সাম্প্রতিক পর্বে এই শ্রেণীর স্মরণীয় চরিত্র সুলভ নয়।

আধুনিক জীবন যত জটিল হচ্ছে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি তত গভীরে যাবে এটাই প্রত্যাশিত ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্যের স্বাদ যত আকর্ষক হয়েছে, গভীরতার প্রশান্তি তত আকর্ষক হতে পারে নি। যে গভীর জীবনবোধ, যে আত্মসংযম, যে পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য থাকলে উপন্যাস মহৎপদবাচ্য, তার শোচনীয় অভাব সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে, তথাপি এই অভাবটাই আজ প্রবল। রমণীমোহন মিষ্টি গল্পের মোহে অথবা যৌন বিকৃতির উত্তেজনায় বা বৈচিত্র্যের লোভে অগভীর জীবনস্রোতে দায়িত্বহীন সন্তরণসুখের নেশায় একালের বাঙালি লেখকরা ধরা দিচ্ছেন, এই সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। তবে আশা আছে, আজকের ব্যতিক্রম ( সুস্থ জীবনধর্মী মানবপ্রধান বাংলা উপন্যাস ) একদিন নিয়মে পরিণত হবে।

কোনো উপন্যাসের আলোচনায় যে প্রসঙ্গ কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না তা হ'ল জীবন সম্পর্কে লেখকের মনোভঙ্গির স্বরূপ নির্ণয়। হাল আমলের বাংলা উপন্যাসের অন্তরালে যে মনোভঙ্গি ক্রিয়াশীল তার স্বরূপ-নির্ণয় সব সময় সমালোচকের পক্ষে সুখকর নয়। এবং এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছুই হতে পারে না যে

জীবনবোধের অভাব বা বিকৃত মনোভঙ্গি বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। আমরা যেন ভুলে না যাই, হেনরি জেমসের স্মরণীয় উক্তি—'No good novel will ever proceed from a superficial mind'। একথা কেবল পাঠকসমাজ নয়, লেখক-সমাজকেও মনে রাখতে হবে।

# পাঁচ বছরের বাংলা-উপন্যাস

গত পাঁচ বছরের ( ১৩৬২—১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ) বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে চিন্তা করলে অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ জাগে না। সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় বাংলা উপন্যাস এই পর্বে এগিয়ে চলেছে। কখনো বা মনে হয় বাংলা উপন্যাস বয়স্ক-পাঠ্য হয়েছে, চিন্তাঋদ্ধ হয়েছে। আবার কখনো মনে হয় তা' দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। কখনো বা মনে হয় সস্তা উত্তেজনার কারবারী। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি সম্পূর্ণ নোতুন পটভূমি। উপন্যাসের একশ' বছরের ইতিহাসে এত গুরুতর পরিবর্তন পূর্বে হয় নি। বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক আভাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। প্রথম নিশ্চিত পদক্ষেপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' (১৮৬৫) গ্রন্থে। রোমান্সের পথ ও বাস্তবমুখীনতার পথ : এই দু'য়েরই আভাস এই দুই গ্রন্থে পাই। তারপর কখনো বা রোমান্স-রসের প্রাদুর্ভাব, কখনো বা বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্রণের জোয়ার।

আজ একশ' বছর পরে যে পটভূমিতে উপন্যাস রচিত হচ্ছে, তা' আগে ছিল না। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি ; জাতীয় জীবনে আমাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছে, এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ( ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ ) পনেরই আগষ্ট যে স্বাধীনতা এসেছে, তা লেখকদেরও নোতুন পথে চিন্তা করতে বাধ্য করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙালি লেখকরা তাঁদের চিন্তায় সে দায়িত্বের পরিচয় দেন নি। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে তার কোন প্রতিফলন হয় নি। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তা' নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বে যে প্রেরণা ও

উদ্দীপনা সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল, তা স্বাধীনতা লাভের পর দেখা গেল না। বোধ করি খণ্ডিত স্বাধীনতা উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাতে পারে নি। বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক পর্বে সম্পূর্ণ নতুন কোনো পথ দেখা গেছে কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে আত্মচিন্তানিষ্ঠ সাহিত্যসেবক যা উত্তর দেবেন, তা' খুব আশাপ্রদ নয়। প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় এইভাবে—সাম্প্রতিক পর্বে এমন কোনো সাহিত্যপত্রিকা আছে কি যা 'বঙ্গদর্শন,' 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাধনা', 'ভারতী, 'সবুজপত্র', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী,' 'কল্লোল', 'বিচিত্রা', 'পরিচয়' (ত্রৈমাসিক) পত্রিকার পর্যায়ে উঠেছে। এর উত্তর—না। এক 'বিচিত্রা' পত্রিকার কথাই ধরা যাক। এই পত্রিকা তিনজন নোতুন লেখককে আবিষ্কার করেছে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা উপন্যাসের চেহারা এই তিন লেখককে অবলম্বন করেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে পল্লী-কেন্দ্রিক প্রকৃতিপ্রেমী আবেগনির্ভর জীবন-দৃষ্টির পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধারার অনুকরণ বাংলা উপন্যাসে বেশ কিছুকাল চলেছে। অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে প্রবাসে' ভ্রমণকাহিনীতে যে বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তির আশ্রয়, 'সত্যাসত্য' উপন্যাসধারায় পাশ্চাত্ত্যমুখী জীবনাদর্শন ও সংস্কারমুক্ত জীবন-সম্ভোগপ্রবণতা লক্ষ্য করা গেল, তার অনুস্মৃতি স্থায়ী হয় নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অতসী মামী' গল্পে যে প্রথাবর্জিত স্পর্ধিত চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন, তা বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

আজ বাংলা উপন্যাস নোতুন পথ-সন্ধান করছে কিনা সেটা এবার চিন্তা করা যাক। 'পথের পাঁচালী', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'সত্যাসত্য' প্রমুখ উপন্যাসের সম-পর্যায়ের উপন্যাস সম্প্রতিকালে ক'টি রচিত হয়েছে? 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (তারাশংকর), 'জাগরী' (সতীনাথ

ভাদুড়ী ), 'শহরতলী, 'আরোগ্য' ( মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় )—কোনো রকম বিশেষ চিন্তা না করেই এই ক'টি উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। উপরি-ধৃত উপন্যাসগুলির সঙ্গে পরে উল্লিখিত উপন্যাসগুলির তুলনামূলক আলোচনা এখানে তুলছি না। পূর্বোক্ত উপন্যাসনিচয়ের প্রভাব ও গুরুত্ব পরবর্তী উপন্যাসগুলি অপেক্ষা ব্যাপ্ত ও গভীর। এ সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই।

গত পাঁচ বছরের বাংলা উপন্যাস-তালিকা পর্যালোচনা করলে মনে হয়, উপন্যাসের গতিপথ সুনির্দিষ্ট নয়, তার লক্ষ্য স্পষ্ট নয় এবং তার পদক্ষেপ কুণ্ঠাপূর্ণ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে প্রত্যাশিত বাস্তবচেতনা, দায়িত্বজ্ঞান, চিন্তাশীলতা, প্রশ্ন-মনস্কতা, গভীরতর জীবনবোধ সর্বত্র দেখা যায় নি। বিশদ বিবৃত করতে হলে বলা যায়, বিরল ক্ষেত্রে তা দেখা যাচ্ছে। জানি, এ মন্তব্য অপ্রিয়, কিন্তু এ-কথা সত্য।

কথাটি আরো স্পষ্ট করা যাক্। উদ্বাস্তু-সমস্যা বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইতিহাস-বিধাতার নির্মম ইচ্ছায় ভারত-রাষ্ট্র খণ্ডিত হ'ল এবং স্বাধীনতা লাভের এক যুগ পরে আজো তার সন্তোষজনক সমাধান হয়নি। এই সমস্যা বাংলা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেই নয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনেও পর্বান্তর ও গভীর সংকটের সূচনা করেছে। কিন্তু হায়! প্রতিষ্ঠ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকরা এই গভীর জটিল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে এড়িয়ে গেছেন। উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে সাম্প্রতিক পর্বে বাংলা উপন্যাস লেখা হয় নি, তা নয়। কিন্তু তা লিখেছেন নবীন লেখকরা। প্রবীণ ঔপন্যাসিকরা যে দায়িত্ববোধ ও সমাজচেতনার পরিচয় দিলেন না, তার জন্য দুঃখ জানাব কাকে? অগত্যা, নবীন লেখকদের আংশিক সাফল্যকে যথা-লাভ বলে মেনে নিতে হয়। এই সমস্যাকে নিয়ে রচিত উপন্যাস অঙ্গুলি-গণনীয়—'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' ও 'বল্মীক'

( নারায়ণ সান্যাল ), 'আবার জীবন' ( সুভাষ সমাজদার ), 'সমুদ্র সফেন' ( আশুতোষ মুখোপাধ্যায় )। আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। যক্ষারোগ আজ বাংলাদেশের যৌবনকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা তো ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। বর্তমান মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে আট লক্ষ টি-বি রোগী আছেন। তাঁদের সম্পর্কে একটি মাত্র উপন্যাস অতিসম্প্রতি বেরিয়েছে—দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'রোদ-জল-ঝড়'। আরো একটি সমস্যার উল্লেখ করি। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পাঞ্চলের মানুষকে নিয়ে একদা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লা কুঠির গল্প লিখে যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তা' পরবর্তীকালে অবহেলিত হয়েছে বা অতি রোমান্টিক কল্পনার আখ্যানরূপ নিয়েছে। এ-দিকে পদক্ষেপে ঔপন্যাসিকদের উৎসাহ খুবই কম। 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' ( গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ) উপন্যাসের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে ঔপন্যাসিকদের কাছে যে সমাজচেতনা, বাস্তববোধ, দায়িত্বজ্ঞান ও প্রশ্নমনস্কতা আশা করেছিলাম, তা' পূরণ হয় নি, একথা স্বীকার করতেই হয়।

ঔপন্যাসিকদের দায়িত্বজ্ঞান ও চিন্তাশীলতার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় কখন? যখন তিনি জীবনে নোতুন মূল্যবোধের জন্য কঠিন মননের পথে অগ্রসর হন। বাংলা উপন্যাস কি মননধর্মিতার পথে অগ্রসর হচ্ছে? পাঠকমন কি এখনো শৈশব উত্তীর্ণ হয় নি? গল্পের লোভ কি এখনো আমাদের কাছে বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাচ্ছে না? শরৎচন্দ্রের ভাবাবেগবিহ্বলতা বা কল্লোল-ভারতী-মানসী-প্রবাসী-গোষ্ঠীর রোমান্টিক জীবনবিলাসের দিন কি বাংলা উপন্যাসে একেবারে শেষ হয়েছে?

এই প্রশ্নগুলি মনে মনে আলোচনা করলে একথাই মনে হয়, বাংলা উপন্যাস এখনো সম্পূর্ণরূপে বয়স্কপাঠ্য হয়ে ওঠে নি। এ'কথা

শোনামাত্রই হয় ত অনেকে আপত্তি করবেন। দেখা যাক, আপত্তি কতদূর গ্রাহ্য ? তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমরা জীবন বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস ('বিচারক', 'সপ্তপদী', 'উত্তরায়ণ') যেমন পেয়েছি, তেমনি আবার আঠারো শতকের পটভূমিতে রোমান্স-কাহিনী ( 'রাধা' ) পেয়েছি। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মননধর্মী উপন্যাস ( 'স্মৃতি', 'সৃষ্টি', 'ঘর' ), দীপক চৌধুরীর গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার কাহিনী ( 'রোয়াক', 'এই গ্রহের ক্রন্দন', 'ফরিয়াদ' ), সুবোধ ঘোষের সামাজিক সমস্যা-বিশ্লেষণ ('সুজাতা', 'শ্রেয়সী' ) বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের যৌবন ও তারুণ্যের নিপুণ বিশ্লেষণ ( 'মৌসুমী' ) আমাদের মননধর্মী উপন্যাস সম্পর্কে ভরসা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এই সঙ্গেই অনিবার্য চিন্তা জাগে—রমণীমোহন দায়িত্বহীন মিষ্টি গল্প বলার মোহ সাম্প্রতিক পর্বে ক্রমশঃ জনপ্রিয় ও লেখকপ্রিয় হয়ে উঠছে।

এই দায়িত্বহীন মিষ্টি গল্পের সহজ সাফল্য বাংলা উপন্যাসকে পতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জানি না, দায়িত্বশীল মননধর্মী জীবনবিশ্লেষক কাহিনী এই পতনের গতিরোধ করতে পারবে কিনা। এই আশংকা আরো প্রবল হয়, যখন দেখি নেশার উত্তেজনা সাহিত্য-বোধকে ছাপিয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, এই নেশা যৌনতার নেশা, এই উত্তেজনা বিকৃত জীবন ভোগের উত্তেজনা, এই দায়িত্বহীনতা রিরংসাপ্রধান ও ভূতুড়ে গল্পের দায়িত্বহীনতা।

ইদানিং এই শ্রেণীর বটতলা-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ও অনায়াস সফলতার মোহে অনেক লেখক ধরা দিচ্ছেন। এর চেয়ে আশংকার কথা আর কিছুই হ'তে পারে না। জীবনের স্বাদবৈচিত্র্য, অ্যাড-ভেঞ্চারের নেশা ও অজানার আকর্ষণ যদি শেষ পর্যন্ত যৌনবিকৃতি, রিরংসা ও ভূতুড়ে পরিবেশে সার্থকতার সন্ধান পায়, তবে সাহিত্যের অপমৃত্যুর বাকি থাকে কি ?

সার্থকতা ও ব্যর্থতার যে-সব উদাহরণ গত পাঁচ বছরের বাংলা

উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—গভীর জীবনবোধে অনুপ্রাণিত উপন্যাস আজ বিরলদর্শন। আজকাল যে ধরনের উপন্যাস আমরা পাচ্ছি তা' রমণীয় বা রমণীমোহন উপন্যাস—pretty novel। দুঃখের বিষয়, উৎকৃষ্ট উপন্যাস আজকাল খুব বেশী প্রকাশিত হচ্ছে না, good novel-এর মরশুম বাংলা দেশে অপসৃত-প্রায়। একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি এ কারণে যে, অগভীর দায়িত্বহীন বাস্তবমনস্কতা-বিরোধী মন কখনো উৎকৃষ্ট উপন্যাসের জন্মদাতা হতে পারে না। হেন্‌রি জেমসের প্রসিদ্ধ উক্তিটি এখানে স্মর্তব্য, No good novel will ever proceed from a superficial mind। লেখকের জীবনবোধের আলোকে যদি উপন্যাস বিশিষ্ট না হ'ল, তবে সে উপন্যাস-পাঠ বৃথা কর্ম।

আসল কথা এই যে, আজ লঘু রুচির লেখক ও পাঠক একদিকে, গভীর জীবনবোধে উদ্দীপ্ত লেখক ও পাঠক অপরদিকে। দুটি শিবিরে বিভক্ত উপন্যাসজগতে এই আদর্শ, চিন্তা ও জীবনদর্শনের সংঘর্ষ আমাদের যদি না অধিকতর দায়িত্বশীল লেখক ও পাঠকে পরিণত করে, তবে বাংলা উপন্যাসের শতাব্দীব্যাপী অগ্রগতির ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যায়।

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে ইংরেজি-ফরাসি-রুশ উপন্যাসের চরিত্র পরিবর্তিত হতে শুরু করে। রমণীমোহন অগভীর জীবন-চিত্রণ থেকে উপন্যাস গভীর বিশ্লেষণধর্মী মননপ্রধান জীবনবোধে উদ্দীপ্ত সাহিত্যকর্মে পরিণত হল ঐ সময়ে। সমাজচেতনা, ইতিহাসজ্ঞান ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল প্রেম, প্রকৃতি আর রোমান্টিকতার বিরোধিতায়। মার্কস্‌, ফ্রয়েড, শোপেনহাওয়ের, নীটশে, বের্গসঁ, ইয়ুং-এর তত্ত্ব উপন্যাসের জগতে গুরুগম্ভীর ছায়া ফেলল। ঔপন্যাসিক বাইরের জগৎ থেকে অন্তরের অনাবিষ্কৃত রহস্যলোকে প্রবেশ করলেন।

শ্রীমতী ডরোথী রিচার্ডসনের সুদীর্ঘ উপন্যাস 'পিলগ্রিমেজ'-এর নায়িকা মিরিয়ম এই চরিত্র পরিবর্তনের স্বরূপটি একটি বাক্যে বর্ণনা করে বলেছে: 'I don't read books for the story, but as a psychological study of the author'। পরিণত বয়স্ক-পাঠ্য আধুনিক উপন্যাসে এই-ই আমাদের প্রত্যাশা। তুর্গেনিয়েফ, ফ্লোবেয়র, বালজাক, স্তাধাল, ডষ্টয়ভস্কি, টলষ্টয়ের মহৎ উত্তরাধিকার পাশ্চাত্ত্য জগতে যোগ্যতার সঙ্গে এ'কালে বহন করেছেন জেমস্ জয়্স, ফ্রান্ৎজ কাফকা, মার্সেল প্রুস্ত, টমাস মান, লাকস্‌নেস, অলডাস হাক্‌স্‌লী, সার্ত্র, আঁদ্রে মোরোয়া, অলবেয়ার কামু, পাস্তেরনাক প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস কি এই মহৎ উত্তরাধিকার বহনের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে?

মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের যে পরিচয় শরৎচন্দ্র উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, তা যতটা বাস্তবচেতন ততটাই রোমান্টিক-লক্ষণাক্রান্ত। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে একই ধরনের চরিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখে মনে হয় মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্লেষণ তাঁর হাতে সত্যনিষ্ঠ তথা বাস্তবভিত্তিক হয় নি। আত্মভোলা পুরুষের নারীর কাছে আত্মসমর্পণ ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর প্রাধান্য ঘোষণায় যতটা হৃদয়াবেগের আলেখ্য পাই, ততটা বিশ্লেষণ পাই না। পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ('পরাধীন প্রেম', 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান', 'জীয়ন্ত' উপন্যাসে) মধ্যবিত্ত জীবনের নির্মম বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আলোচ্য-মান পর্বে সর্বাধিক সাফল্য দাবি করতে পারেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র ('চেনামহল' ও 'তিনদিন তিনরাত্রি'), তারপর বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র। বস্তুত এই ক্ষেত্রে এঁদের সাফল্য তর্কাতীত। মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্লেষণে এঁরা এমন নির্মম সত্যনিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ তিক্ত জীবন-সমালোচনার পরিচয় দিয়েছেন, যা শরৎ-উপন্যাসে ছিল না।

সুবোধ ঘোষের একটি উপন্যাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। সেটি হ'ল 'শতকিয়া'। মানভূমের গ্রামজীবনের পটভূমিতে আধুনিক কালের অনিবার্য নিশ্চিত পদক্ষেপ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি-বিশ্বাস ও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের অসহায় পরাভবের সুন্দর একটি আলেখ্য এই উপন্যাসে চিত্রিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। একটি অমোঘ নিষ্ঠুর ট্রাজিক পরিণতিতে 'শতকিয়া'র সমাপ্তি। উপন্যাসটিতে যে সাংকেতিকতার আভাস আছে তা' গ্রন্থের বাতাবরণকে ব্যাপ্তি দিয়েছে।

আধুনিক প্রেমের প্রশ্নসংকুল বিক্ষুব্ধ দুশ্ছেদ্য অন্তর্জটিলতার অনুসরণে ও তার স্বরূপ উদঘাটনে যে ঔপন্যাসিকরা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম অবশ্যউল্লেখ্য।

জীবনের বৈচিত্র্য সন্ধানে সতত তৎপর 'বনফুল' তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতার নোতুন পরিচয় দিয়েছেন আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনে আদর্শের রূপদানে আত্মনিয়োগ করেছেন। জরাসন্ধের 'তামসী' উপন্যাসে নিষ্ঠুর নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরতা একটি নারী-কয়েদীর অন্তরালেখ্য সহৃদয়তার সঙ্গে উদঘাটিত হয়েছে।

আলোচ্যমান পর্বের দুটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের মনোযোগ দাবি করেছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বৈচিত্র্য সন্ধানে বেরিয়ে লেখকরা ইতিহাস-রোমান্সের এবং অভিনব পটভূমিতে বিচিত্র বৃত্তির মানুষের আলেখ্য অংকন করেছেন। ঐ দুই ক্ষেত্রে মননশীল জীবন-বিশ্লেষণের উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে স্বাদ-বৈচিত্র্য ও রস-বৈচিত্র্য। এবং তার অর্থ এই, সাম্প্রতিক উপন্যাস জীবনমুখী না হয়ে জীবন-বিমুখী হচ্ছে। তা' নিশ্চয়ই আনন্দের কথা নয়।

প্রথম ধারাটি হল ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের ধারা। উনিশ

শতকের খণ্ডিত রেনেসাঁস ও সিপাহীযুদ্ধ নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস সম্প্রতি লিখিত হয়েছে। কয়েকজন আরো পেছিয়ে গিয়ে আঠারো শতকের বর্ণবহুল রোমাঞ্চ-রোমান্স-সমৃদ্ধ পটভূমির আশ্রয় নিয়েছেন। এই ধরনের উপন্যাসের ব্যবসায়গত সাফল্যে অনেকেই মোহবদ্ধ হয়েছেন।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ( 'রাধা' ), প্রমথনাথ বিশী ( 'সিন্ধুনদের প্রহরী' ও 'কেরী সাহেবের মুন্সী), গজেন্দ্রকুমার মিত্র ( 'বহ্নিবন্যা' ), মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ( 'নটী' ), বিমল মিত্র ( 'সাহেব-বিবি-গোলাম' ), রমাপদ চৌধুরী ( 'লালবাঈ' ) প্রভৃতির নাম এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় বিস্তৃত পটভূমি রচনার যে ক্ষমতা, যে উদ্যোগ-আয়োজন, যে উপকরণ-চয়ন, যে ইতিহাস-জ্ঞান প্রয়োজন, তা' এঁদের সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু নিকট-অতীত সবক্ষেত্রে সত্যের নির্মোহ আলোকে উদ্ভাসিত ও বিশ্লেষিত হয়নি। বহুক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই সত্য হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালিমানসের দোলাচলচিত্ততা, জাতীয় আন্দোলন, অর্থনৈতিক সংগ্রাম বা বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশকে অবলম্বন করে এই ক্ষেত্রে যে এপিক-উপন্যাস সৃষ্টির অনুকূল অবসর ছিল, তা অবহেলিত। ইতিহাসবোধের অনিবার্যতা ও নিকট-অতীতের মোহমুক্ত বিশ্লেষণের সার্থক পরিচয় বিধৃত হয়েছে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে। এই শ্রেণীর উপন্যাসরাজির মধ্যে এটি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। লেখক এত নিপুণভাবে বারবার ইতিহাস ও রোমান্সের সীমারেখা অতিক্রম করে দু জগতেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন যে তা আমাদের মুগ্ধ করে। আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নের চরিত্রটি কয়েকটি নিপুণ রেখায় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ইঙ্গিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

যে এপিক-সম্ভাবনা এই শ্রেণীর উপন্যাসে ছিল, তার সদ্ব্যবহার হয় নি বলে যে আক্ষেপ, তা সমকালের ঘটনাপ্রবাহের চিত্রণেও প্রযুক্ত।

দেশ-বিভাগ ও রাজনীতিক পটপরিবর্তনকে অবলম্বন করে এপিক-উপন্যাস কি লেখা যেতো না ? অবশ্যই যেতো, কিন্তু আমাদের লেখকরা তা গ্রহণ করলেন না। দ্বিতীয় যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা —যে কোনো একটি বিষয়কে নিয়েই এপিক-উপন্যাস লেখা যেতো। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামকে নিয়ে একটি ছাড়া ( দেবেশ দাশের 'রক্তরাগ') উপন্যাস লেখাই হল না, একি কম আক্ষেপের কথা ! দেশ-বিভাগকে অবলম্বন করে একটি মাত্র উপন্যাস আমার চোখে পড়েছে, তা হ'ল—অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড়শ্রীখণ্ড'। 'ধাত্রীদেবতা' ও 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় তারাশংকর যে বিস্তৃত পটভূমি ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার নোতুন ও অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত পরিচয় পেলাম 'গড়শ্রীখণ্ডে'। দেশ-বিভাগের সময়কার রাজসাহীর গ্রামাঞ্চলের কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। দেশ-বিভাগের বেদনাবহ বৃত্তান্ত এখানে জাতীয় পটভূমিতে শিল্পরূপ লাভ করেছে। জীবনকে সামগ্রিক রূপে নিরাসক্তভাবে দেখাবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন অমিয়ভূষণ।

১৯৩০ থেকে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ : এই তিরিশ বছরে বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে ভাঙাগড়া, দ্রুত পরিবর্তন, পুরনো মূল্যবোধের অপসারণ ও নোতুন মূল্যবোধের জন্য তৃষ্ণা : এ সবই মহৎ শিল্পকর্মের উপজীব্য হতে পারে। সুখের কথা এই যে অসহযোগ আন্দোলন থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা পর্যন্ত ব্যাপ্ত-জীবনে বাঙালি যে সুধা ও বিষ আহরণ করেছে, তার সত্য পরিচয় কয়েকটি উপন্যাসে রূপলাভ করেছে। একই প্রসঙ্গে স্বতই যে নামগুলি মনে আসে, তা হল—'দেওয়াল' ( বিমল কর ), 'ধুলোমাটি' (ননী ভৌমিক), 'শ্রীমতী কাফে' ( সমরেশ বসু ), 'গোপাল দেব' ( অসীম রায় )।

দ্বিতীয় যে ধারাটির কথা উল্লেখ মাত্র করেছি—তা হল বিচিত্র পরিবেশে বিচিত্র বৃত্তির মানুষের জীবনবৈচিত্র্যের আলেখ্য। এই

শ্রেণীর উপন্যাসের সাফল্য অনায়াসলভ্য, এর বিপদও অনিবার্য। বৈচিত্র্য ও অভিনবতা মূলধন করে ঔপন্যাসিকরা এই ক্ষেত্রে কল্পনাবিলাসের প্রশ্রয় দেন। সাংবাদিকতাধর্মী রম্যরচনার সঙ্গে এই শ্রেণীর উপন্যাসের পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। তাই বিপদ পদে পদেই। ন্যাচারালিজমের যে ধারাটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোড়ার দিকের উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল তারই রকমফের বলে মনে হতে পারে তথাকথিত সাম্প্রতিক আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিকে। বিভূতিভূষণের অপরিচিত অবজ্ঞাত বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু গভীর প্রকৃতি-প্রেম, অসামান্য শিল্পবোধ ও অভিজ্ঞতার সারল্যে তিনি জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের অন্তেবাসী মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করলেন ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার জোরে। সম্প্রতি বিচিত্র জীবন-রূপায়ণ যতটা হচ্ছে, ততটা গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। গত পাঁচ বছরে রচিত এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে অবশ্য-উল্লেখ্য কয়েকটি নাম হ'ল—'পূর্বপার্বতী', 'সিন্ধুপারের পাখি', 'নাগমতী' ( প্রফুল্ল রায় ), 'গঙ্গা' ( সমরেশ বসু ), 'তিতাস একটি নদীর নাম', ( অদ্বৈত মল্লবর্মণ ), 'নীলসিন্ধু' ( শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ), 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' (রমাপদ চৌধুরী)। এই শ্রেণীর সবক'টি উপন্যাসই সার্থক নয়। এইগুলিতে রোমান্সের স্বাদ, বৈচিত্র্যের উত্তেজনা, অপরিচিতের মোহ যতটা আছে জীবনের স্বাদ বা গভীর জীবনবোধের পরিচয় ততটা নেই। পটভূমি পরিবর্তন করলে কয়েকটিকে আধুনিক প্রেমের রম্য-উপাখ্যান বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। আসল কথা-বিচিত্র পটভূমি নির্মোকের মতো কাহিনীতে সংলগ্ন হয়ে আছে, অন্তরঙ্গরূপে মিশ্রিত হয় নি। শহরের মানুষকে অপরিচিত জীবনের বৈচিত্র্য-রস-উপভোগ করাবার জন্যই কতকগুলির জন্ম। এই অভিযোগ এঁরা বিচার করবেন, এটা আশা করছি। কেননা, এঁদের উপর আমাদের ভরসা প্রচুর।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ('গৃহদাহ'), বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মানিক—এইসব প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরা উপন্যাসকে যে স্তরে উন্নীত করেছেন, সেই সার্থকতার স্তরে সম্প্রতিকালের বাংলা উপন্যাস থাকছে না, এই আশংকার কারণ ঘটেছে। একে অস্বীকার করে লাভ নেই। শিল্পক্ষমতা বা কাহিনী-গ্রন্থন-নৈপুণ্য, ভাষা বা ঘটনা-সংস্থাপনের চাতুর্যই যথেষ্ট নয়,—এ'কথা আজকের ঔপন্যাসিক ও পাঠককে বুঝতে হবে। গভীর জীবনবোধ ও জীবনদর্শন যদি না পাই, তবে উপন্যাস পড়ব কেন? অবসরবিনোদক রমণীয় মোলায়েম সুখপাঠ্য কাহিনীর যুগ শেষ হয়ে গেছে, এটা স্বীকার করাই ভালো। অথচ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালে মনে হয় সে যুগ এখনো অবসিত হয় নি। এই কালাতিক্রমণ ও কালানৌচিত্য-দোষ থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'র মতো সুখপাঠ্য কাহিনীর দিন গেছে। আজ তীব্র তিক্ত জীবন-জিজ্ঞাসা, গভীর বিশ্লেষণ ও নির্মম আত্মানুসন্ধানের দিন এসেছে। গল্পপাঠের সুখ আজ আর অনুশীলিত পাঠকের কাম্য নয়। শিশুমনস্ক গল্পপ্রিয় রোমান্স-উত্তেজিত পাঠকের দিন শেষ হয়েছে; অন্তত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে উপন্যাস-লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষেরই সমান দায়িত্ব রয়েছে।

শুধু গল্পরস উপভোগ বা রোমান্স রস আস্বাদনের জন্য আজ আর ঔপন্যাসিকদের কাছে যেতে রাজি নই, তত্ত্বসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ-উজ্জ্বল জীবনবোধের উপস্থিতি যাঁর উপন্যাসে আছে তাঁর কাছেই যাব। আশা করি এ'কালের ঔপন্যাসিকরা এই অভিলাষকে বাস্তবে রূপ দান করবেন। যাঁরা অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় বিশ্বাসী নন বা অভিজ্ঞতার নির্মোহ বিশ্লেষণে আগ্রহী নন, তাঁদের জন্য রইল রূপকথা, রোমান্স আর রমণীমোহন কাহিনী। আমার জন্য থাক গভীর জীবনবোধে ভাস্বর, বিশ্লেষণসমৃদ্ধ উপন্যাস।

# বাংলা উপন্যাসে নারীর দান

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য বাঙালি-চিত্তের নবজাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত। এই নব জাগরণের আলোকস্পর্শে বাঙালি তার পরিচিত সংসারে নোতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিল। বাইরের জগৎ ও জীবনকে সে যেমন গ্রহণ করেছিল, পরিচিত অন্তঃপুরেও তেমনি শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এক অনাবিস্কৃত জগতকে আবিষ্কার করেছিল।

বাংলা সাহিত্য কেন, ইংরেজি সাহিত্যেও উনিশ শতকটি নব জাগরণের যুগ। এই উদ্বোধনের লক্ষণ পরিচিত সংসারের সর্বত্র দেখা গিয়েছে। একটি লক্ষণ হলো নারীর সুচিরকালব্যাপী তন্দ্রার অবসান। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব উনিশ শতকের ইয়োরোপের জীবনে সর্বত্র অনুভূত হয়েছিল। এই প্রভাবের অন্যতম পরিচয় সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর আগমন। ইংরেজি উপন্যাসের উষাকালে জেন অস্টেন এসেছিলেন দৈনন্দিন সংসারের আলেখ্য নিয়ে। সে আলেখ্য পরিচিত জীবন থেকে ভিন্নতর। নোতুন আবিষ্কারের আনন্দ ও বিস্ময় জেন অস্টেনের উপন্যাসে ( ১৮১১-১৭ ) লক্ষ্য করা গেল। নারীর দৃষ্টিতে সংসারের আলেখ্য দেখে সেদিনের ইংরেজ পাঠক বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছিল।

ভিক্টোরীয় যুগে প্রগতির অন্যতম দিকে হলো নারীপ্রগতি। সাহিত্যেই তার নির্ভুল প্রকাশ ঘটল। জর্জ এলিঅট ও ব্রণ্টে ভগিনী-ত্রয়ের উপন্যাসে তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল।

এমিলি ব্রন্টের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে রচিত কবিতাটি নারীর স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষার সুন্দর অভিব্যক্তি। নারীকণ্ঠে এই প্রথম শোনা গেল আপন ভাগ্যরচনার দাবি ও অকুণ্ঠ আত্মঘোষণা:

No coward soul is mine,
No trembler in the world's
Storm-troubled sphere;
I see Heaven's glorious shine,
And faith shines equal, arming me from fear.

জর্জ এলিঅট ও ব্রন্টে ভগিনীত্রয়ের উপন্যাসে নারীর স্বাধিকার ঘোষণার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগ ধ্বনিত হল। সমাজে নারী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে অনুযোগের সুর, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গভীর অসন্তোষের সুর ও অন্তর্বিদ্রোহের অনতিপ্রচ্ছন্ন সুর এঁদের উপন্যাসের প্রতি চরণে ধ্বনিত হয়েছে। "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা।"—এই প্রশ্নের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা এঁদের উপন্যাসে শোনা গেল। অ্যান ব্রন্টের The Tenant of Wildfell Hall (১৮৪৮), এমিলি ব্রন্টের Wuthering Heights (১৮৪৭), শার্লত্ ব্রন্টের Jane Eyre (১৮৪৭), Shirley (১৮৪৯) ও Villette (১৮৫৩) উপন্যাসে ইংরেজ-ললনার আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অতি সাধারণ অবস্থার স্ত্রীলোকের জীবনে ভালোবাসা পাবার ও দেবার অধিকার এবং তার নির্ভীক সংকোচহীন অভিব্যক্তি এই সব উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। বিদুষী মেরী অ্যান ইভান্স 'জর্জ এলিঅট' এই ছদ্মনামে লিখলেন Adam Bede (১৮৫৯), The Mill on the Floss (১৮৬০), Silas Marner (১৮৬১), Romola (১৮৬৩), Middlemarch (১৮৭২) উপন্যাসগুলি। শেষের দুটিতে পুরুষোচিত পাণ্ডিত্যাভিমান ও বিশ্লেষণপ্রবণতা নারীসুলভ কমনীয়তাকে

ব্যাহত করেছে, তা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু প্রথম তিনটি উপন্যাসে ইংলাণ্ডের গ্রামীণ জীবনের অন্তরঙ্গ আলেখ্য রচনায় নারীসুলভ কোমলতার ছাপ রয়েছে। মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য, শিশুর লীলালেখ্য-রচনার কমনীয়তা ও প্রেমব্যাকুলা নারীহৃদয়ের তীব্রতা শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমানের উপর জয় লাভ করেছে।

কয়েক দশকের মধ্যেই বিদ্রোহের স্থানে এলো আত্মবিশ্বাস, অভিযোগের স্থানে এলো প্রসন্ন মাধুর্য, পাণ্ডিত্যাভিমানের স্থানে নারীহৃদয়ের কোমলতা। ইংরেজি উপন্যাসে নারীর স্বতন্ত্র দান আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো। ইংরেজি উপন্যাস মেনে নিলো নারীহৃদয়ের এই দাবি ঃ

আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমারে স্মরি সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না-তারায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সূর্য চন্দ্র ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা। (রবীন্দ্রনাথ)

পুরুষশাসিত ইংরেজি সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগে নারীর আসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি ধ্বনিত ও স্বীকৃত হয়েছে উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে। এই দাবির সুন্দর পরিচয় পাই প্রথম ঔপন্যাসিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতায় ঃ

ওগো কমল-আসনা রঞ্জিনী বীণাপাণি।
আমি কাহারেও আর জানি না ভারতি,
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা—

তোমারে পর্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
আমি জানি না ত' তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ
শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ,
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।

স্বর্ণকুমারীর দেবীর এই প্রার্থনা বঙ্গভারতী মঞ্জুর করেছিলেন, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। কাব্য-গাথা-গান-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ—সর্বক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবী সচ্ছন্দে বিচরণ করেছিলেন।

গত শতকের বাংলা কাব্যে মহিলার দান স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আদর্শায়িত প্রেমের রূপধ্যানে, দাম্পত্য প্রেমের আলেখ্য অংকনে, গার্হস্থ্যজীবনের রূপায়নে, দেশপ্রেমের প্রকাশে, প্রকৃতির ধ্যানে, বিষাদের অভিব্যক্তিতে, এমন কি তত্ত্বের কাব্যরূপায়নে মহিলা-কবিদের আগ্রহ ও নৈপুণ্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমারী ধর, মৃণালিনী সেন, সরোজকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী দাশ, পঙ্কজিনী বসু, প্রমীলা নাগ, লজ্জাবতী বসু, হিরন্ময়ী দেবী, স্বর্ণলতা বসু, সরলাদেবী চৌধুরাণী, সরলাবালা সরকার, সুরমাসুন্দরী ঘোষ, নীরদমোহিনী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, অন্নদাসুন্দরী দাসী, নিস্তারিণী দেবী, অনঙ্গমোহিনী দেবী, প্রভাবতী রায়, বিরাজমোহিনী দাসী প্রমুখ বহু মহিলা-কবি গত শতকের শেষ পাদে ও বর্তমান শতকের প্রথম পাদে

বাংলা কাব্যোদ্যানে নানা রঙের ও আকারের কাব্যপুষ্প উপহার দিয়েছেন।

কাব্য ও উপন্যাসে বাঙালি মহিলাশিল্পীদের দান তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনার যোগ্য। এই সাহিত্যসম্পদের আলোচনায় পুরুষশাসিত বাংলা সাহিত্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে,

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।

( রবীন্দ্রনাথ )

॥ ২ ॥

মহিলা-রচিত বাংলা উপন্যাসে ঘরের ডাক প্রাধান্য লাভ করেছে। তা অশান্ত সাহিত্যপথিককে শান্তি ও আশ্রয়ের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছে, বাঙালির ছিন্ন জীবনকে প্রীতিডোরে বেঁধেছে। বাংলা তথা ভারতবর্ষে শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে নারীকে স্বাধিকার লাভের সুযোগ থেকে বহুকাল ধরে বঞ্চিত করা হয়েছে ; দুর্গমের দুর্গ থেকে প্রাণপণ করে সাধনার ধন আহরণের প্রচেষ্টায় নারীকে বার বার বাধা দেওয়া হয়েছে ; বিপরীতক্রমে পুরুষশাসিত সমাজের অনুগ্রহ ও দৈবানুকূল্যের আশায়, ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের জন্য নারীকে সুচির শর্বরী জেগে কাটাতে হয়েছে। এই শর্বরী অবসানের সূচনা হয়েছিল গত শতকের মধ্যবিন্দুতে কলকাতায় মহামতি বেথুন, মিস মেরি কার্পেন্টার ও পুণ্য-শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাধনায়। নারীর সর্বাঙ্গীন মুক্তি আজো সমাজে ও পরিবারে অপেক্ষিত। এ সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। আশ্চর্যের কথা, বাংলা সাহিত্যে নারীর মানসমুক্তির প্রথম প্রহরটি এসেছে গত শতকেই। বাংলা উপন্যাসে নারীর দান স্বীকৃতি লাভ করেছে গত শতকের শেষ দশকে স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায়।

এই কারণে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামোল্লেখ ব্যতীত এই আলোচনা খণ্ডিত হতে বাধ্য। স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক ও পারিবারিক উপন্যাস রচনায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার্য যে, তাঁর উপন্যাস ( 'দীপনির্বাণ' ১৮৭৬, 'মালতী' ১৮৮০, 'স্নেহলতা' ১৮৯২, 'কাহাকে' ১৮৯৮ ) প্রথম শ্রেণীর নয়। অবশ্য তখন বাংলা উপন্যাসের প্রথম প্রহর। . এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেউ জীবনরহস্যের সার্থক আলেখ্য অংকন করতে পারেন নি। স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুজ রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট' ( ১৮৮৩ ) ও 'রাজর্ষি' ( ১৮৮৭ ) বেরিয়েছে, 'চোখের বালি' ( ১৯০৩ ) তখনো অনেক দূরে। এই পটভূমিতে লেখিকার একটি পারিবারিক উপন্যাস বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। সেটির নাম "কাহাকে", প্রকাশতারিখ জুলাই, ১৮৯৮। স্বর্ণকুমারী দেবীর এটি সর্বোত্তম উপন্যাস। নারীহস্তের নিঃসংশয়িত ছাপ এই উপন্যাসে বর্তমান। অন্যান্য উপন্যাসে পুরুষোচিত পাণ্ডিত্যাভিমান, তথ্যপ্রদর্শনস্পৃহা, বিশ্লেষণের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু "কাহাকে" এই সব দোষমুক্ত।

এই উপন্যাসের নায়িকা শিক্ষিতা মহিলা, এখানে তার প্রেম-জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। নায়িকা সকল প্রগল্ভতা, বুদ্ধি-অহমিকা ও দম্ভ থেকে মুক্ত। প্রেমের পাত্রনির্বাচনে স্থির চিন্তা ও দৃঢ়তার অভাব, বার বার ভুল করে ভুল ভাঙার বেদনা ও পুনর্বার ভুল করার জন্য উন্মুখতা, অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার আলোড়নে ক্লিষ্টা রমণীহৃদয়ের সকল মাধুর্য ও কারুণ্য এখানে প্রকাশিত হয়েছে। শেষে রমণীয় পরিণতিতে সকল দ্বিধার অবসান ঘটেছে।

॥ ৩ ॥

বিশ শতকের ষাট বছরে মহিলা-রচিত বাংলা উপন্যাসের আশ্চর্য প্রসার ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এই শতকের গোড়া থেকে দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পূর্ব পর্যন্ত একটি যুগ, এবং সমরোত্তর সাম্প্রতিক পর্ব পর্যন্ত আরেকটি যুগ—মহিলা-রচিত উপন্যাসসাহিত্যে দেখা যায়।

বিশ শতকের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে সার্বভৌম সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, পূর্ববর্তী সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শাসনের নিশ্চিত অবসান ঘটল। এ কথার তাৎপর্য এই, পাশ্চাত্ত্য জগতকে তার ধ্যানধারণা, যৌবনোন্মাদনা ও প্রাণচাঞ্চল্য-সমেত আমরা সাহিত্যে ও জীবনে মেনে নিলাম। বঙ্কিমের সমাজ-কল্যাণচিন্তার স্থানে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা সাহিত্যে বেশি গুরুত্ব অর্জন করল, জাতীয়তাবাদ ও অতীতানুরাগের স্থানে বর্তমানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেল। অতীতের নিশ্চিত আশ্রয়কে ত্যাগ করে বর্তমানের অনতিস্পষ্ট চঞ্চল ধূসর জীবনপ্রবাহকে বরণ করে নেবার গভীর আগ্রহ বাঙালির জীবনে লক্ষ্য করা গেল। যৌথ পারিবারিক জীবনের বহুমুখী ও সুনির্দিষ্ট কর্মভার থেকে তরুণ বাঙালি মুক্ত হতে চাইল। ব্যক্তিগত আত্মানুসন্ধান, সমাজশাসনমুক্ত ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন ও পারিবারিক ভূমিকার বাইরে স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণের মনোবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করল। হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও সুচিরকালের আদর্শের পটভূমি অপসৃত হলো, উপন্যাসের পটভূমিতে পরিবর্তমান গতিশীল জীবনচিত্র দেখা গেল। মানবজীবনের মৌলিক বৃত্তিসমূহের চর্চা ও বিকাশ সাধন অপেক্ষা ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা, বিকৃতি, অতিতীক্ষ্ণতা ও অস্বাভাবিকতার চিত্রাংকনের ঝোঁক উপন্যাসে

লক্ষ্য করা গেল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের (১৯১৬) পাত্রপাত্রীরা আমাদের সুচিরকালের সনাতন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের গোড়া ধরে ঝাঁকুনি দিল।

এর ফলে স্বভাবতই সংঘর্ষ উপস্থিত হলো। নারীজীবনে এই সংঘর্ষ চমৎকার রূপ লাভ করল মহিলা-রচিত উপন্যাসে। ফলে প্রাক্-দ্বিতীয় সমর-পর্বে মহিলা-রচিত উপন্যাসে অতীতাশ্রয়িতা ও আধুনিকতা, সনাতন মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য ও ব্যক্তিসত্তার নব মূল্যায়ন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের লেখিকারা স্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একদিকে, অনুরূপা দেবীর নেতৃত্বে এক দল প্রাচীন জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতির, দ্রুত বিলীয়মান পারিবারিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগের পক্ষ সমর্থন করেছেন, অপরদিকে সীতা দেবী শান্তা দেবীর নেতৃত্বে আর একদল লেখিকা শিক্ষিতা আধুনিকার জীবনসংগ্রাম ও তজ্জনিত শ্রান্তি, নৈরাশ্য ও অন্তরের শূন্যতাকে চিত্রিত করেছেন, তার মধ্যে প্রেমের দৃপ্ত আবির্ভাবকে স্বাগত করেছেন। এই দুই গোষ্ঠীর লেখিকাদের নিজেদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীবন্ধন ও সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুত এই পর্বেই মহিলা-ঔপন্যাসিকদের জীবনদর্শনের বিশিষ্টতা ও রসানুভূতির সুকুমার সূক্ষ্মতা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় সমরোত্তর পর্বের লেখিকাদের উপন্যাসে এই নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য অপসৃত হয়েছে। আলোচ্য পর্বে নারী-ঔপন্যাসিকরা পুরুষ-ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোহে আপন বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেন নি। প্রথম বিশ্বসমরের কালে বাংলা উপন্যাসের নদীতে যে সমস্যা-সংকুল চড়া মাথা তুলেছে, তা মহিলা-রচিত উপন্যাসের রসকে ব্যাহত করতে পারে নি। নারীপ্রকৃতির কোমলতা, মাধুর্য, আত্মপ্রকাশ-ভীরুতা, প্রেমের অপ্রতিরোধ্য প্রকাশব্যাকুলতা মহিলা-রচিত উপন্যাসে সকল পাণ্ডিত্যাভিমান, তর্কপ্রবণতা, তত্ত্বমুখিতার উপর জয়লাভ করেছে।

অনুরূপা দেবীর সাহিত্যসাধনা প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বিস্তৃত। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াচিত্রে সেগুলি আদৃত হয়েছে বার বার, তাঁর 'মা' ও 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসদুটির বিক্রয়-সংখ্যা ঈর্ষাযোগ্য। বর্তমান শতকের মহিলা-রচিত উপন্যাসের অন্যতম প্রধান ধারার নেত্রীস্থানীয়া অনুরূপা দেবী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। উনিশ-শতকী হিন্দু সংস্কৃতি সাধনা, প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি ভক্তি ও ধর্মানুশাসনের প্রতি আনুগত্য অনুরূপা-উপন্যাসে কেবল সাহিত্যিক প্রত্যয় মাত্র নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। অনুরূপা-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা যে আকাশতলে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেখানে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুশাসন অভ্যর্থিত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। অনুরূপা দেবী সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। তাঁর প্রবন্ধে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিপাদনের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তা উপন্যাসে অনুস্যূত হয়ে আছে। ভূদেব-বঙ্কিমের কল্যাণাদর্শ অনুরূপা দেবী কখনো বিস্মৃত হন নি, তাঁর উপন্যাসরাজির পরিণতি তার পরিচয়স্থল। অনুরূপা-উপন্যাসে যে হিন্দু সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে, তাকে আমরা মানি আর না মানি, সে সমাজের প্রাণশক্তি এখনো বর্তমান। অন্যথায় অনুরূপা-উপন্যাসের জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা মেলে না।

একালের পাঠকসমাজ অনুরূপা-উপন্যাসের সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত নয়, তাতে আমাদেরই ক্ষতি। অনুরূপা-উপন্যাস একালের উপন্যাসরচনার যোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই স্বীকৃতি পাই সাম্প্রতিককালের ঔপন্যাসিকা শ্রীমতী বাণী রায়ের কাছে—"যদি তিনি অজস্র রচনার দ্বারা বর্তমান যুগের জন্য ভূমি প্রস্তুত করে না যেতেন, তাহলে আবার ওই 'মা' ও 'মন্ত্রশক্তি' থেকেই আরম্ভ করতে হত। তাই আমরা, বর্তমানের লেখিকারা, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি।" ('নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ')।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে চরিত্র-বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও ঘটনার মর্মোদ্‌ঘাটন-কৌশল পাশ্চাত্ত্য লিখনভঙ্গীসুলভ। তিনি সনাতন ধর্মবোধের জয়গান করেছেন, এ'কথা সত্য, কিন্তু বিদেশী গল্পোপন্যাসের কাহিনী-ঋণগ্রহণে কুণ্ঠিত হন নি। অনুরূপা-উপন্যাসে পূর্বরাগমূলক ঘটনাসংস্থান অবিরল। অধিকাংশ উপন্যাসের উপজীব্য প্রেম। কিন্তু সে প্রেম বিশুদ্ধ বৈধ প্রেম। আধুনিক প্রেমসমস্যাও আছে। একের প্রতি দুজনের, দুজনের প্রতি একের প্রেম, জাতিভেদ ও কুলগত কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ, প্রণয়ভঙ্গ—সবই আছে, কিন্তু সবার উপরে আছে ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রেমের জন্য ত্যাগের মহিমা কীর্তন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র-তালিকায় কেবল নরনারী নয়, আরো একজন আছেন। তিনি হলেন গৃহ-বিগ্রহ। অধিকাংশ উপন্যাসেই এঁর দেখা পাওয়া যায়। 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে গৃহ-বিগ্রহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক। এসম্পর্কে আচার্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "উপন্যাসের অন্যান্য মনুষ্য-চরিত্রের মধ্যে দেববিগ্রহ গোপীনাথ জিউকে একটি চরিত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বাস্তবিক সকলের অপেক্ষা ইনিই অধিক ক্রিয়াশীল, উপন্যাসোক্ত ঘটনার ঠিক কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত। দেবমন্দিরের ধূপ, দীপ, শঙ্খ, ঘণ্টা, যোড়শোপাচারে পূজার আয়োজন-সম্ভার—ইহারই বর্ণনা উপন্যাসের অধিকাংশ স্থল অধিকার করিয়া আছে। দেববিগ্রহই বাণীর প্রথম প্রীতিভাজন—তাহার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি-অর্ঘ্য ইনি প্রথম হইতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ইঁহার প্রসাদ-লাভে অসমর্থ বলিয়া বেচারা অম্বর বাণীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের সমস্ত জটিল সূত্র ইঁহার করতলধৃত। যেমন সূর্যমণ্ডল হইতে কিরণরাশি ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি ইঁহারই মন্দিরতল হইতে উপন্যাসে ঘাত-প্রতিঘাতমূলক শক্তি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক উপন্যাসে দেব-চরিত্রের এই প্রাধান্য

হিন্দু ধর্মজীবনে মোটেই অস্বাভাবিক নহে। আমাদের ধর্মজীবনের এই বিশেষত্ব—বাস্তব জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার অনন্যসাধারণ গৌরব ও কৃতিত্ব।" ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা')

অধুনা বাংলা উপন্যাসে এই ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। এখন উপন্যাসে গ্রহ-বিগ্রহ গোপীনাথজিউর শাসন অপসৃত হয়েছে, তিনি উদ্বাস্তু হয়ে ধর্মগ্রন্থে অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। বাংলা উপন্যাস এখন আর দেব-বিগ্রহের প্রসাদলাভে জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করে না। 'মন্ত্রশক্তি'র দেবকৃপাবঞ্চিত অম্বরনাথের অধুনা সুদিন এসেছে।

অনুরূপা দেবার পথানুসারিণী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যা হলেন ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরিবালাদেবী সরস্বতী, প্রভাবতীদেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া।

ইন্দিরা দেবী অনুরূপা দেবীর অগ্রজা সুরূপা দেবীর ছদ্মনাম। তাঁর 'স্পর্শমণি', 'প্রত্যাবর্তন', 'পরাজিতা', 'স্রোতের গতি', 'ফুলের তোড়া' উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যা, বিশেষতঃ দাম্পত্য মনোমালিন্যের ও পুনর্মিলনের সহৃদয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের উপজীব্য একই—প্রেমবিরোধ ও দাম্পত্য সংঘর্ষ। 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বিধিলিপি', 'শ্যামলী', 'দিদি' উপন্যাসে বাঙালির গৃহজীবনের অতিপরিচিত পরিবেশে নিরুপমা দেবী রস সৃষ্টি করেছেন। বৈচিত্র্য ও উত্তেজনাহীন পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনে ভুল বুঝাবুঝি ও তার অবসানের চিত্রটি সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। অনুরূপা-উপন্যাসের চেয়ে নিরুপমা-উপন্যাসে নারীহস্তের কোমল স্পর্শটি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

গিরিবালাদেবী সরস্বতীর 'দানপ্রতিদান', 'হিন্দুর মেয়ে', 'রূপহীনা', 'কুড়ানো মানিক' উপন্যাসে এই ধারার বিশ্বস্ত অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'খণ্ডমেঘ' উপন্যাসটি একটি বিরল ব্যতিক্রমরূপে

বিস্তারিত আলোচনা দাবি করে। এই উপন্যাসের পরিবেশ ও নায়ক-চরিত্র গতানুগতিকতাবর্জিত। নায়ক ভৈরব অরণ্যচারী, নদী তার সখা, পশু তার মিতা। পালক-পিতা সন্ন্যাসী তারাদাস তাকে অপরিচিত পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে চোখ বুঁজলেন। এই অরণ্যচারী দেবকান্তি ভৈরব লোকালয়ে এসে কীভাবে মানবীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করল ও আবার অরণ্যে ফিরে গেল, তারই বর্ণনা এই উপন্যাসের উপজীব্য। লেখিকার কাব্য-বর্ণনা এই আখ্যানকে মহত্ত্ব দান করেছে। চিরাচরিত ধারা থেকে বিচ্যুত এই উপন্যাসটি আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

প্রভাবতীদেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, ঊষাদেবী সরস্বতী রক্ষণশীল ধারায় গার্হস্থ্যচিত্র অঙ্কন করেছেন।

॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় ধারার নেতৃত্ব করেছেন সীতা দেবী ও শান্তা দেবী। শিক্ষিতা আধুনিকা রমণীর কঠিন জীবনসংগ্রাম, তজ্জনিত শ্রান্তি ও নৈরাশ্য, তারই মাঝে প্রেমের কুণ্ঠাহীন দৃপ্ত পদক্ষেপ এই ধারার উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। বিশুদ্ধ বৈধ শাস্ত্রসম্মত প্রেম অনুরূপা দেবীর উপজীব্য, কিন্তু এই ধারায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রেমকেও সাহিত্যে স্বীকৃতি দান করা হলো। প্রথম বিশ্বসমরের কিছু পরে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর আবির্ভাব ঘটল 'প্রবাসী'র পাতায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসংস্কৃতির প্রভাব শহরের—বিশেষ করে কলকাতার বাঙালি নারীসমাজে কী আলোড়ন ও বৈচিত্র্য এনেছে, তার অন্তরঙ্গ পরিচয় এঁদের উপন্যাসে পাওয়া যায়। অনুরূপা-ইন্দিরা-নিরুপমার উপন্যাসের নারীচরিত্র গ্রামের সমাজে ধর্মীয় প্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর শহরে নারীমন আপন প্রেরণাতেই প্রকাশিত, কোনো ব্রাহ্মণ্য আদর্শ বা পারিবারিক

কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। সীতা দেবী শান্তা দেবীর নায়িকারা শহুরে জীবনে কঠিন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত, প্রায়শই মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, চাকুরীজীবী—অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রী। দৈহিক সৌন্দর্যের দ্বারা পুরুষের মন ভুলানোর প্রয়াস তাদের জীবনের সাধনা নয়। মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষা হওয়ার ও পরিশীলিত রুচি প্রদর্শনের একটি ভদ্র প্রয়াস এই সব আধুনিকা নায়িকাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। নারী পুরুষের সম্পর্কে একটি নোতুন অধ্যায় এই ধারায় সূচিত হলো।

সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা', 'পথিক-বন্ধু', 'পরভৃতিকা', 'বন্যা', 'মাতৃঋণ', 'জন্মস্বত্ব', ও শান্তা দেবীর 'জীবনদোলা', 'চিরন্তনী', 'অলখঝোরা' প্রভৃতি উপন্যাসে আত্মমর্যাদাসম্পন্না নারীর জীবনে প্রেমের আবির্ভাব ও জয়লাভের কাহিনী সূক্ষ্মদর্শিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। আজ আর এই সব উপন্যাসের পূর্বতন জনপ্রিয়তা নেই, কিন্তু তিরিশ বছর আগে এগুলিতেই বাঙালি নায়িকার দৃপ্ত পদধ্বনি শোনা গেছে। জীবিকা অর্জনের কঠিন সংগ্রাম, প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বেদনা, ঊষর জীবনপথে প্রণয়ের আবির্ভাবে বিহ্বলতা ও সঙ্কুচিত মনোভাব, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষে প্রণয়ের কাছে আত্মসমর্পণ—এই ঘটনা-পরম্পরার মাধ্যমে নারীহৃদয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয়টি এঁদের উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

নারীহস্তের কোমল স্পর্শ আলোচ্যমান উপন্যাসগুলিতে কমনীয়তা-গুণ আরোপ করেছে।

এই ধারার অনুসৃতি লক্ষ্য করা গেল আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, মায়া বসু, জ্যোতির্মালা দেবীর উপন্যাসে। আশালতা সিংহের 'সমর্পণ', জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ', 'মনের অগোচর', 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' প্রভৃতি উপন্যাসে পারিবারিক জীবন ও বাইরের জীবন—এ' দুয়ের আকর্ষণে দোলাচলচিত্তা নায়িকার আলেখ্য অঙ্কিত

হয়েছে। তবে এই সব ক্ষেত্রে সমস্যা কখনই খুব গভীর নয়, সমাধানও কঠিন নয়। নায়িকাচরিত্রের খানিকটা স্বাধীন স্ফুরণই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মায়া বসুর 'ত্রিধারা' উপন্যাসটি এ'প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

॥ ৫ ॥

মহিলা-রচিত উপন্যাসে আধুনিকতম যুগের সূচনা হলো দ্বিতীয় বিশ্বসমর কালে। এই যুগটি পূর্বতন ধারাছুটি থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন। দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন-সমালোচনার ক্ষেত্রে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এর পূর্বে উপন্যাসের ইতিহাসে মহিলা-রচিত উপন্যাস একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় দাবি করেছে। সে স্বাতন্ত্র্য নারীসুলভ কোমলতা ও গৃহগত-প্রাণতার জন্য, পারিবারিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মবুদ্ধির প্রতি আনুগত্যের কারণে, অতীত ও ঐতিহ্যাশ্রয়িতার জন্য। কিন্তু অধুনা মহিলা-রচিত উপন্যাসের জন্য কোনো স্বতন্ত্র বিচার দাবি করা হয় না, বা হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সমাজজীবনে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে 'বিশেষ সংরক্ষিত অধিকার' এখন আর দাবি করা হয় না। পুরুষের অনুগ্রহের দানগ্রহণে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর যেমন বাধে, সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে 'বিশেষ বিবেচনা'র দাবি জানাতেও তেমনি বাধে। নিঃসন্দেহে এটি শুভলক্ষণ।

মনন-চিন্তা পুরুষেরই একচেটিয়া নয়, সে ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার ও সামর্থ্য আছে—আধুনিক মহিলা-রচিত উপন্যাসে তার পরিচয় পাই। নায়িকার জীবনে কেবল ধর্মের আহ্বান বা প্রেমের আকর্ষণ নয়, বাহিরবিশ্বের আহ্বানও বর্তমান, তা এই প্রথম জানা গেল। মহিলা-রচিত উপন্যাসের প্রথম যুগে উপন্যাসগুলি সাধারণতঃ নায়িকাপ্রধান হতো, বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত ভূমিকাকে প্রাধান্যদানের প্রয়াস তার অন্তরালে ছিল। কিন্তু এখন আর

নায়িকাপ্রধান উপন্যাস রচনায় নয়, জীবনালেখ্য চিত্রণে মহিলা-ঔপন্যাসিকরা অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। অনুরূপা-ইন্দিরা-উপন্যাসে প্রাচীন পরিবার-ব্যবস্থায় নারীর স্থান ও সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছিল, সীতা-শান্তা উপন্যাসে নারীর স্বাধিকার লাভের প্রাথমিক প্রয়াসের ও প্রাচীন সমাজব্যবস্থার বাইরে নির্ভীক পদক্ষেপের পরিচয় লাভ করি। কিন্তু এখন আর কোনো 'বিশেষ সংরক্ষিত অধিকার' ছাড়াই জীবন-পর্যালোচনায় লেখিকারা অগ্রসর হয়েছেন।

আধুনিক পর্বের ঔপন্যাসিকাদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, সাবিত্রী রায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ও সুলেখা সান্যালের নাম বিশেষ আলোচনা দাবি করে। আরো কিছু নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। মহিলা-ঔপন্যাসিকের সংখ্যাধিক্য ও তাঁদের উপন্যাসের সংখ্যাবহুলতা থেকে ব্যাপক নারীজাগরণের স্থূল পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উপর্যুক্ত সাত জন লেখিকার গত দুই দশকে রচিত উপন্যাসপাঠে পূর্বধৃত মন্তব্যের সমর্থন পাই।

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের উপজীব্য পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিজীবনে সংঘর্ষ। লেখিকা সাহসের সঙ্গে নবীনের পক্ষাবলম্বন করেছেন। পূর্বে যেখানে অনুরূপা-উপন্যাসে নায়িকা প্রেম অপেক্ষা ধর্মবোধ ও পারিবারিক কর্তব্যনিষ্ঠাকে বড়ো করে দেখেছে, বর্তমানে সেখানে আশাপূর্ণা-উপন্যাসে দেখি প্রাচীনপন্থী পিতামাতা নবীনপন্থী সন্তানদের কাছে পরাজিত হচ্ছেন। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের ইঙ্গিত প্রথমে পাই আশালতা সিংহের 'সমর্পণ' উপন্যাসে। আশাপূর্ণা দেবীর 'বলয়গ্রাস', 'শশীবাবুর সংসার' প্রভৃতি উপন্যাসে সেই ভাঙনকে সৎসাহসের সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। নারীহস্তের কোমল স্পর্শ আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে যতটা পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পাই পুরুষোচিত মননপ্রধান জীবনদৃষ্টি। 'শশীবাবুর সংসার'-এ প্রাচীন-পন্থীর পরাজয়চিত্রণে লেখিকা অকম্পিতা, আবার 'বলয়গ্রাস'-এ

মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তিনি পুরুষোচিত নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য শেষোক্ত উপন্যাসে টুনি নামক শিশু-চরিত্র-বিশ্লেষণে নারীহস্তের কোমল স্পর্শটি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত নয়।

লীলা মজুমদার ও বাণী রায়—উভয়েই বিদুষী লেখিকারূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। পুরুষসুলভ মননশক্তি উভয়ের যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তার পরিচয় তাঁদের প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্পে সর্বত্রই মিলে। তবে লীলা মজুমদারের ঝোঁক শৈশবস্মৃতিচিত্রণে, আর বাণী রায়ের ঝোঁক অতৃপ্ত যৌবনের ব্যাকুলতা প্রকাশে। উভয় ক্ষেত্রেই বিপদের সম্ভাবনা ছিল। প্রখর সচেতনতা ও প্রশংসনীয় মননশক্তির জোরে এঁরা সে বিপদ উত্তীর্ণ হয়েছেন।

লীলা মজুমদার শিশুসাহিত্য রচনায় পারদর্শিনী। তিনি সুকুমার রায়ের পিতৃব্য-কন্যা। শিশুসাহিত্য রচনার সংস্কার তাঁর বড়োদের জন্যে লেখা উপন্যাসেও বর্তমান। এইজন্য 'ঝাঁপতাল', 'জোনাকি', 'লাল নীল দেশলাই বাক্স' উপন্যাস পড়তে গিয়ে বারবার শিশুদের জন্যে লেখা 'পদীপিসীর বর্মি বাক্স'-এর কথা মনে পড়ে। অথচ তাঁর মতো বিদুষী মননশালিনী সুলেখিকার কাছে আমাদের প্রত্যাশা কম নয়।

বিদুষী লেখিকা বাণী রায়ের 'প্রেম', 'শ্রীলতা-শম্পা', 'কনে-দেখা আলো', 'আরও কথা বলো' উপন্যাসগুলি স্বকীয় চরিত্রে বিশিষ্ট। নারীজীবনের নির্ভীক উন্মোচনে, দুঃসাহসিক বিশ্লেষণে, অভিনব উপস্থাপনে তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচর দিয়েছেন। 'প্রেম' উপন্যাসেই বাণী রায়ের নিন্দা-প্রশংসামিশ্রিত খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপন্যাসে যে বক্তব্যের উপস্থাপনা, পরবর্তী উপন্যাসত্রয়ে তারই বিস্তার। 'প্রেম'-এর নায়িকা রূপালী লাহিড়ী বাংলা উপন্যাসে মনে রাখার মতো চরিত্র। লেখিকার প্রিয় চরিত্র রূপালী। একে তিনি বহু নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে লেখিকা দাবী করেন। 'প্রেম' উপন্যাসের উৎসর্গ-পত্রে লেখিকা লিখেছেন ঃ "পৃথিবীর কোথাও যদি

সে মেয়ে থাকে, যে পুরুষের হাতে ক্রীড়নক হয় নি—তারই উদ্দেশে দিলাম।" এই উৎসর্গ থেকেই লেখিকার মনোভঙ্গির পরিচয় পাই। 'কনে-দেখা আলো'র উৎপলা, 'শ্রীলতা-শম্পা'র শ্রীলতা ও 'আরও কথা বলো'র মণিমালা ও কেয়া রূপালী লাহিড়ীর নব নব সংস্করণ। প্রেমের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, প্রেমের প্রভাবে পরিবর্তন, তার তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ব-সম্মত বিশ্লেষণ, স্বাধীনার জীবনে প্রেমের স্থান, স্বপ্নময়ীর মোহভঙ্গের বেদনা, বাস্তবচারিণীর মনোবেদনা, প্রেম ও বাস্তবে দুস্তর ব্যবধান,—এ'সবেরই মোহমুক্ত বিশ্লেষণ উপর্যুক্তচরিত্রগুলির মাধ্যমে করা হয়েছে। নারীচরিত্রচিত্রণে বাণী রায় জীবনের একটি নোতুন জানালা খুলে দিয়েছেন।

প্রতিভা বসুর পথ প্রখর জীবন-সমালোচনা বা তিক্ত বিশ্লেষণের পথ নয়। তিনি মিষ্টি রোমান্টিক প্রেমের চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্তা। তাঁর জীবন-দৃষ্টিতে বাস্তবের তিক্ততা নেই, কিন্তু জীবনের প্রতি মমতা ও কোমল অনুভূতি আছে। এখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠাভূমি। তাঁর 'মনের ময়ূর', 'মনোলীনা', 'সমুদ্র-হৃদয়' উপন্যাস এর পরিচয়স্থল। কিন্তু প্রতিভা বসু যে প্রয়োজন হলে নির্মম হতে পারেন তার পরিচয় পাই 'বিবাহিতা স্ত্রী' ও 'মধ্যরাতের তারা' উপন্যাসে। সংসারের গরলমিশ্রিত বঞ্চনার উপচার 'বিবাহিতা স্ত্রী' উপন্যাসে তিনি উপহার দিয়েছেন। প্রমীলার চরম স্বার্থপরতা ও ইতরতার চিত্রাঙ্কনে প্রতিভা বসু নির্মম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আর 'মধ্যরাতের তারা' উপন্যাসে পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন রূপ চিত্রণে প্রতিভা বসুর এই দক্ষতায় পাঠক অধিকতর প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়।

এ'কালের মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সাবিত্রী রায়ের নাম অবশ্য-উল্লেখ্য। তাঁর তিন খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ উপন্যাস 'পাকা ধানের গান' পাঠকের বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের মেহনতী মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনীকে তিনি যে ব্যাপক পটভূমিতে

দৃঢ়গভীর রেখায় অঙ্কন করেছেন, তা'তে বিস্মিত হতে হয়। জীবনের যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র উপাদান সাবিত্রী রায় সংগ্রহ করেছেন, তা যে কোনো জীবননিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ঈর্ষাযোগ্য। এই বিপুল বিচিত্র উপাদান সংগ্রহে সাবিত্রী রায় যতটা ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার ব্যবহারে তদনুরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। পাঠকের এই আক্ষেপই তাঁর কাছে অধিকতর সাফল্যের প্রত্যাশা করে।

সুলেখা সান্যাল উপন্যাসের জগতে স্থান করে নিয়েছেন তাঁর 'নবাঙ্কুর' উপন্যাসে। নায়িকা ছবি গ্রামের কিশোরী ; উপন্যাসের শেষে সে যুবতী, গ্রাম ছেড়ে নগরের বৃহত্তর জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। পরিবার-জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী ও পারিবারিক অনুশাসনের কঠোর বিধান ভেঙে ছবি কীভাবে বেরিয়ে আসছে, সে চিত্র খুব কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রত্যক্ষ। ছবি কলকাতায় এসে পৌঁছবার পর জীবনপথে নিজেকে কী ভাবে চালিত করল, এই কৌতূহলে উপন্যাসের সমাপ্তি। আশা করব, লেখিকা এই কৌতূহলের তৃপ্তি ঘটাবেন।

অতিসম্প্রতিকালে প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক উপন্যাস লিখে তিনি দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। 'নটী' উপন্যাসের পটভূমি সিপাহী-বিদ্রোহ। এক শ বছর আগেকার বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ সৃজনে তিনি যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করেছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে জনৈক সিপাহী ও এক নটীর রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান তিনি গড়ে তুলেছেন। পরবত উপন্যাস 'যমুনা কী তীর'-এ বছর চল্লিশ আগেকার কলকাতা, গয়া ও বারানসীর পেশাদার মার্গসঙ্গীতশিল্পী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ভূস্বামী-সমাজের পটভূমিতে তরুণ ওস্তাদ আনন্দ, রাজকুমারী ইন্দুমতী ও বাহার বাঈর রোমান্টিক ত্রিভুজ প্রেমকাহিনী লেখিকা রচনা করেছেন। এই দুই উপন্যাসেই লেখিকার স্থানিক রঙ-পরিবেশ সৃজনের ক্ষমতা ও রোমান্টিক আখ্যান রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একই

উপাদানের বারবার ব্যবহারে একঘেয়েমি আসা স্বাভাবিক। সে-কারণে পরবর্তী উপন্যাস 'প্রেমতারা'য় লেখিকা পটভূমি বদলেছেন। সার্কাসের খেলোয়াড় মনোহর ও ট্রাপিজের শিল্পী প্রেমতারার প্রেমোপাখ্যান এই গ্রন্থ। গভীর জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার নিঃসংশয় পরিচয় এগুলিতে পাই না। লেখিকা সে বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, তার প্রমাণ চতুর্থ উপন্যাস 'তারার আঁধার'। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান মানবজীবনে ট্রাজেডি সৃষ্টি করে, নায়ক বিজয় দাশের মধ্য দিয়ে সে তত্ত্বটিকে লেখিকা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত নায়কের জীবনে আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে যে অনতি-ক্রম্য ব্যবধানের ফলে জীবন ব্যর্থ হয় ও পরিণামে হাহাকারে নিজেকে শতধাবিদীর্ণ করে ফেলে, সেই পুরানো কাহিনীকেই লেখিকা এখানে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তত্ত্ব স্থাপনার সচেতনতা যতটা আছে, তার রসপ্রতিমানির্মাণে লেখিকা ততটা সাফল্যলাভ করেন নি। তবে মহাশ্বেতা ভট্টচার্য যে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানের স্বপ্নলোক থেকে বাস্তবের কঠিন ভূমিতে অবতরণ করতে চেয়েছেন, এটা আশার কথা।

সাম্প্রতিক পর্বের প্রতিনিধিস্থানীয়া উপর্যুক্ত সাতজন ঔপন্যাসিকার রচনার এই পর্যালোচনায় আশা করি, এ'কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলা উপন্যাসে নারীর বিশিষ্ট বক্তব্য ও নিজস্ব দান আছে। বাংলা উপন্যাসের বিপুল প্রবাহে মহিলারচিত উপন্যাসের ধারাটি ক্ষীণ নয়,— এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আশা করি অন্যায় হবে না। পূর্বেকার ধর্মাশ্রয়ী জীবনদৃষ্টি, দীন বিষয়বস্তু, সাদামাটা ঘরোয়া পরিবেশের স্থলে এখন এসেছে সুস্থ জীবনানুরাগ, বিচিত্র বিষয়বস্তু ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা। এই সবের নিপুণ ব্যবহারে বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে অদূর ভবিষ্যতে জেন অস্টেন বা জর্জ এলিঅটের আবির্ভাব ঘটবে, পাঠক হিশেবে এই আমার আশা। আর সেদিন মহিলা-রচিত উপন্যাসের স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন বিলুপ্ত হবে।

# সাম্প্রতিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস

দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পরবর্তীকালে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস পড়ে আমরা না হই সুখী, না হই দুঃখী। অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখের দিন আর নেই। সামগ্রিক জীবনবোধ বা মানবপ্রেম এখন আর পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের প্রধান প্রেরণাস্থল নয়। রম্যাঁ রলাঁ-র 'জাঁ ক্রিস্তফ', বা টমাস মান্-এর 'ম্যাজিক মাউন্টেন' ( Der Zauberberg ) বা মার্সেল প্রুস্ত-এর 'ইন্ সার্চ অব লস্ট টাইম' ( A la recherche du temps perdu ) উপন্যাসের আর দেখা পাই না। 'ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর সেই আশ্চর্য পরিবেশ—সুইজারলাণ্ডে যক্ষ্মাশৈলনিবাসে ইয়োরোপের সকল রাজ্যের রোগীদের ভিড়, প্রথম সমরোত্তর ইয়োরোপের সকল বিশ্বাস, চিন্তা ও ভাবনার সমাবেশ এবং এরই মাঝে নায়ক জর্মান যুবক হান্স কাস্প্রপ্-এর আত্ম-অনুসন্ধান ও গূঢ় জীবন-এষণা এক গভীর ব্যাপ্তি লাভ করেছে। মতবাদের সংঘর্ষে ও সমাবেশে জীবনের একটি পরিপূর্ণ ছবি এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার রলাঁ-র 'জাঁ ক্রিস্তফ্'-এ একটি তরুণ সাংগীতিক প্রতিভার আত্ম-অন্বেষণের ও জীবনোপভোগের বিচিত্র সুন্দর ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই দুই উপন্যাসে ( বিশেষত দ্বিতীয়টিতে ) প্রেমের একটি বড় ভূমিকা আছে। জর্মন ও ফরাসি সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ সুন্দর ও ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ, তার প্রতিনিধিরূপে 'জাঁ ক্রিস্তফ' আমাদের মনোহরণ করে। আর প্রুস্ত-এর 'ইন্ সার্চ অব লস্ট টাইম' নামক মহৎ উপন্যাসটিতে হারিয়ে যাওয়া প্রেমের অর্থাৎ জীবনের অন্বেষণ আবেগসমৃদ্ধ কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁচেছে। কিন্তু এ প্রেম সুখের নয়, সরল নয়, সহজ নয়। ঈর্ষা, সংশয় এ প্রেমের মধ্যে মিশে আছে; এই উপন্যাস তারই অপরূপ

কাহিনী। হোক তা ঈর্ষামিশ্রিত, হোক তা সংশয়াচ্ছন্ন, তবু তা প্রেম। স্মৃতি-রোমন্থনের অবকাশে জীবনের একটি সমগ্র ছবি আমরা এখানে পাই।

এই তিনটি মহৎ উপন্যাসেই জীবনের সামগ্রিক রূপচিত্রণের একটি সৎ প্রয়াস লক্ষ্য করি। কালচেতনা তথা জীবনচেতনা থেকে উপরোক্ত শিল্পীরা কখনো বিচ্যুত হন নি। কোনো বিশেষ ধর্ম বা রাজনীতি, দর্শনচিন্তা বা প্রত্যয়ের আকর্ষণে গোটা জীবনটাকে অস্বীকার করেন নি। মানবমনের অস্তিত্বের স্বরূপ-সন্ধানে তাঁরা এগিয়েছেন বটে কিন্তু খণ্ড বা বিকৃত বা অসম্পূর্ণ জীবনকে শেষ কথা বলে মনে করেন নি। ঐক্যবোধ, সামগ্রিক চেতনা, অভিপ্রায়ের অখণ্ডতা ও জীবনবোধের পরিপূর্ণতা এঁরা স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এই সামগ্রিক জীবনচেতনা খুব বেশিদিন পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে রইল না। তার স্থানে এলো খণ্ড জীবনবোধ, এলো অংশের প্রতি অতিমনোযোগ; এলো বিকৃতির উপর ঝোঁক, এলো কোনো বিশেষ প্রত্যয়ের প্রতি অতি-আস্থা। এ'কালের পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে সংশয় ও দ্বিধাই শেষ কথা নয়, তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে জীবন-বিরোধিতা। এটিই সবচেয়ে আশংকার কথা। হয় সাম্যবাদ, না হয় ক্যাথলিক ধর্ম —উপন্যাস-রচনায় এ দুটিই প্রবলতম প্রেরণারূপে দেখা গেছে এবং দুক্ষেত্রেই মতবাদ-পাগলামি বড় হয়ে উঠেছে।

জীবন-বিরোধিতা একালের পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে প্রকট হয়ে উঠেছে। এর কারণ হয়ত দ্বিতীয় বিশ্বসমর। যুদ্ধের ফলে কেবল দেশ ধ্বংস ও লক্ষ লক্ষ মানুষ হত, আহত, উৎখাত হয়েছে, তাই নয়; সেই সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধগুলির উপর যে আস্থা ছিল, তা বিনষ্ট হয়েছে। তার ফলে মানসিক নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। এরই নাম হলো জীবন-বিরোধিতা। জাঁ পল সার্‌তর্‌-এর কথাই ধরুন না কেন! এই শতাব্দীর ফরাসি সাহিত্যে-দর্শনে সার্‌তর্‌ একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব।

তিনি প্রথমে জীবনানুরাগী ছিলেন, আজ তিনি জীবনবিমুখী। অস্তিত্ববাদ (একসিস্টেনসিয়ালিজম্) যাঁরা প্রবর্তন করেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। সব রকম শৃঙ্খলা ও আইনকে অস্বীকার করে অস্তিত্বকে অস্তিত্ববাদীরা স্বীকার করেন এবং অস্তিত্বের নির্দেশে চালিতে হতে ইচ্ছা করেন। 'Les chemins de la liberte' শীর্ষক উপন্যাসধারায় সার্‌ত্‌র্ অস্তিত্ববাদী নায়ক-চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন। 'L' Age de raison' (১৯৪৫), 'Le Sursis' (১৯৪৯), এবং 'La Mort dens L'ame' (১৯৫০)—নামক তিনটি উপন্যাস এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। এর পর আরো একটি উপন্যাসে পরিণতি অপেক্ষিত। মানুষকে সকল প্রকার বাধানিষেধ আইন-শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত অবস্থায় স্বভাব-ধর্মে দেখানো হয়েছে। সমাজের প্রতি এই সব উপন্যাসের নায়কদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। সমাজকে অস্বীকার করাতেই এঁদের আনন্দ, এতেই তাঁরা মুক্তি সন্ধান করেছেন। জীবন সম্পর্কে এই নেতিবাচক ধারণা আমাদের সুখী করে না।

রঁম্যা রলাঁর আদর্শবাদ বা মার্সেল প্রুস্ত-এর কাব্যসুরভিময় পরিবেশ বা টমাস্ মান্-এর সুগভীর জীবন-অন্বিষ্ট কাহিনী থেকে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দূরে চলে গেছে। সার্‌ত্‌র্ অস্তিত্ববাদ বর্জন করে সাম্যবাদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত বর্জন করেছেন; শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যকে আশ্রয় করেছেন।

আবার অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন ক্যাথলিক স্বর্গে। সেখানে মানুষের আদিম পাপ-চেতনা অতি প্রকট। ক্লোদেলের কাব্যে, ফ্রাঁসোয়া মোরিআক, আঁদ্রে জিদ, অলব্যের কামু-র উপন্যাসে এই ধারণা প্রাধান্য লাভ করেছে। ফরাসি সাহিত্যের বাতাবরণে তাই সুস্থ জীবনের কোনো আশ্রয় নেই; আশ্বাস নেই। মানবতাবোধ যদি এঁদের নাটক-উপন্যাস-কাব্যে দেখা যায়, তা গভীর নিরাশাগ্রস্ত। মনোবিশ্লেষণ এঁদের হাতে জীবনের ব্যবচ্ছেদে পরিণত হয়েছে।

অপর দিকে, আমেরিকার সাহিত্যে বিকৃত জীবনের ছবি প্রাধান্য লাভ করেছে। মানুষের হিংস্রতা ও জিঘাংসার প্রতিচ্ছবি দেখি প্রকৃতির উলঙ্গ নিষ্ঠুরতায়। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের লেখায় এর অপ্রতুলতা নেই। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে উপন্যাসে-গল্পে সনাতন নীতিকে তুলে ধরেছেন—দাঁতের বদলে দাঁত, নখের বদলে নখ। অবশ্য তাঁর শেষ রচনা 'ওল্‌ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' উপন্যাসে তিনি প্রকৃতির ভয়াল নিষ্ঠুর রূপ না এঁকে মহান গভীর সহানুভূতিশীল দিকটি দেখিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক আমেরিকান কথাসাহিত্যে জীবনের অন্ধকার দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে। হত্যা, ডাকাতি, বলাৎকারের বর্ণনায় তা পূর্ণ।

সাম্প্রতিক ইতালীয় গল্প-উপন্যাসের উপর আমেরিকান সাহিত্যের প্রভাব খুবই প্রকট। শীর্ষস্থানীয় ঔপন্যাসিক আলবার্তো মোরাভিয়ার বহুখ্যাত বহুনিন্দিত উপন্যাস 'উওম্যান অব রোম' বাস্তব বর্ণনার নিষ্ঠুরতায় ও নির্মম বিশ্লেষণে আমাদের চিত্তকে অসাড় করে দেয়। স্তাঁধালের অনুগামী মোরাভিয়া জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তা এতই রূঢ় ও সহানুভূতিহীন যে আমরা এখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না।

জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে এই-যে নিষ্ঠুরতা ও শবব্যবচ্ছেদীয় মনোবৃত্তি, অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতি, তা সুস্থ জীবনানুরাগের পরিচয়স্থল নয়। অতি-সম্প্রতি-প্রকাশিত কয়েকটি বহু-আলোচিত পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের সামান্য পরিচয়ে এই অভিমতের পোষকতা হবে।

ফরাসি লেখিকা ফ্রাঁসোআ সাগঁ-র রচিত 'স্বাগত, বিষাদ' ( 'বঁজুর, ত্রিস্তে' ) উপন্যাসটিতে অস্বাভাবিক যৌন-জীবনচিত্রকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। পিতা, পিতার রক্ষিতা ও কন্যা—উপন্যাসের এই তিনটিমাত্র চরিত্র। যৌনাকর্ষণের বিকৃতি ও বেদনাকর পরিণতিই এর মুখ্য বক্তব্য। জনৈক আমেরিকাবাসী রুশ লেখকের একটি ইংরেজি উপন্যাস সম্প্রতি খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এটি হ'ল নবোকভ

রচিত 'লোলিটা' উপন্যাস ; এতে জনৈক প্রৌঢ় একটি কিশোরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিশোরীর বিধবা জননীকে বিবাহ করেছে এবং কিশোরীর সঙ্গে যৌন-মিলনের সুযোগ খুঁজেছে। কাহিনীর অতিসংক্ষিপ্তসার থেকেই ঔপন্যাসিকের বক্তব্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সুস্থ জীবন-চেতনার পরিচায়ক বলে এগুলিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

হালের আরেকটি খ্যাতনামা উপন্যাস হল অতি-প্রশংসিত অতি-নিন্দিত নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যকীর্তি—'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাস ; লেখক বৃদ্ধ রুশ কবি বরিস পাস্তেরনাক। উপন্যাসটি ইতালীয় ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিক হয়েছে ; মূলে রুশ ভাষায় লিখিত, অদ্যাবধি তা অপ্রকাশিত। রুশ-দেশের তিরিশ বছরের কাহিনীর পটভূমিতে বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর ঘটনাতরঙ্গের শীর্ষে উপনীত একটি চরিত্র এই উপন্যাসের নায়ক। হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান্ অ্যাণ্ড দি সী' এবং পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো'—এই দুটি উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের মুক্তি ঘটেছে ক্যাথলিক নীতিবোধের পাপচেতনা বা অস্তিত্ববাদের অস্বাভাবিকতা থেকে। আধুনিক মানুষের সাহিত্য ও নীতি-ধর্মের কাব্যময় শিল্পরূপ বলে 'ডক্টর জিভাগো' অভিনন্দিত হয়েছে। এই উপন্যাসে রুশ বিপ্লবের নিষ্ঠুর অমানুষিকতা ও তার সম্মুখে মানুষের অসহায়তাকে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা হয়েছে, বিপ্লব হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। নায়কের সমস্যা-সংকট ও সংকটের মাঝে নিক্রিয়তা এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তার একটি কারণ বলে মনে হয়। তথাপি এই উপন্যাসের প্রতীকধর্মিতা, সামগ্রিক জীবনবোধ, রুশ-লোককাহিনীর পটভূমি, কালচেতনা, সর্বোপরি কাব্যসুরভি আমাদের আবিষ্ট করে।

সাম্প্রতিক ইংরেজি উপন্যাসক্ষেত্রে নজর করলে দেখি জীবনের জয়গান অপেক্ষা আধুনিক জীবনের যান্ত্রিকতা, অসুস্থতা ও নিষ্ঠুরতার চিত্রাংকনেই ঔপন্যাসিকদের আগ্রহ বেশি। সাম্প্রতিক ইংরেজি উপন্যাসে ফরাসি উপন্যাসের মতই ক্যাথলিক নীতিবোধ প্রবল। অসতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ইংরেজ লেখক সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। গ্রাহাম গ্রীন, ইভলীন ওয়াঘ ধর্মে রোমান ক্যাথলিক, লেখাতেও তার ছাপ রয়েছে। জয়স্ কেরী, সি পি স্নো, কিংস্‌লি অ্যামিস্, অ্যাঙ্গাস উইলসন—এঁরা উপন্যাসে ক্যাথলিক নীতিবোধকে প্রাধান্য দেন নি, আধুনিক জীবনের হৃদয়হীনতা ও নির্মমতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। একদিকে গ্রাহাম্ গ্রীনের 'দি হার্ট অফ্ দি ম্যাটার' উপন্যাসের নায়ক ব্রিটিশ পশ্চিম আফ্রিকার কলোনীতে ক্যাথলিক পুলিশ অফিসার; এই নায়ক বিবেকের দ্বারা চালিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। অপর দিকে জয়স্ কেরীর একটি উপন্যাস-ধারার (যার এগারোটির মধ্যে সাতটি ইতঃমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে) নায়ক লুইস্ এলিঅট; সে আইনজীবী। যুদ্ধের সময় সরকারি অফিসার ছিল; ব্রিটেনের নোতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে সে দেখা দিয়েছে—যে সম্প্রদায়ের জীবনে মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা অর্জন এবং তার জন্য ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত কিছু বাজি ধরতেও তারা পিছপা নয়। আবার দ্বিতীয় সমরোত্তর যুগের নোতুন লেখক অ্যাঙ্গাস উইল্‌সনের উপন্যাসে একালের মধ্যবিত্ত ইংরেজ সম্প্রদায়ের নির্মম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'হেমলক্ অ্যাণ্ড আফটার,' ও 'অ্যাংলো-স্যাক্সন অ্যাটিচুডস্' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত ইংরেজের দোষগুলি দেখানো হয়েছে। নির্মমতা, নীচতা, ইতরতা মধ্যবিত্ত মানুষকে কি ভাবে গ্রাস করেছে, তার সার্থক পরিচয় এখানে পাই। সাম্প্রতিক ইংরেজি উপন্যাস তাই জীবনবিরোধী নয়, কিন্তু জীবন থেকে তা অমৃত আহরণ করে নি, হলাহল পান করেছে।

বিশ শতকের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করে আমরা যে জগতে উপনীত হয়েছি, সেখানে মানবিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে আর সে পরিবর্তনের সার্থক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে মধ্যবিত্ত জীবনে। তাই মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্লেষণে বাস্তববাদী জীবনশিল্পীমাত্রেরই অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। ফরাসি উপন্যাসে এর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন পাই অলব্যের কামুর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'দি ফল' ('The Fall')-এ। 'Le chute' নামে ফরাসি ভাষায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থায়ী কীর্তি বলে পরিগণিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষের যে নির্মম বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা'তে অন্যায়ের সঙ্গে গোপন আপোষ, দৈনন্দিন জীবনের স্থূলতা ও ইতরতার সঙ্গে বোঝাপড়া, ভীরুতা, স্বার্থপরতা—সবই বিশ্লেষণের সূচীমুখে ধরা পড়েছে। উপন্যাসের নায়ক আগাগোড়া আত্মকথনের ভঙ্গীতে তার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে। নায়ক জঁ। ব্যাপতিস্ত ক্লামেন্স পারীর ভূতপূর্ব ব্যারিস্টার, বর্তমানে আর্মষ্টারডামে বাস করে। কুখ্যাত 'মেক্সিকো সিটি' পানশালায় বা জুইডারজী নদীর কুয়াশা-ঘেরা পথে সদ্য-পরিচিতের কাছে সে তার আত্মকাহিনী উদ্ঘাটন করেছে। তার 'কনফেশ্যনে' ক্লামেন্স আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের ভণ্ডামি ও নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও চরিত্রহীনতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শহীনতার নির্মম বিশ্লেষণ করেছে। আমাদের নীচতা ও ভণ্ডামি কেবল নয়, ন্যায়বিচারের জন্য দাবি ও সেইসঙ্গে নির্দোষ প্রমাণিত হবার অত্যাকাঙ্ক্ষায় যে অসংগতি, তাও নায়কের বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসে আধুনিক জীবনের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের মাঝে নায়কের আর্তক্রন্দন আমাদের বিচলিত করে। 'দি ফল' না পড়ে থাকা যায় না; পড়ে তা ভুলে যেতে চাই, কিন্তু ভুলতে পারি না।

আধুনিক মানুষের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতা, সুখান্বেষণ ও

আত্মতৃপ্তির নির্মম বিশ্লেষণ কামু করেছেন এই উপন্যাসে। জুইডারজী নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে সদ্য-পরিচিতকে নায়ক পাদ্রী ক্লামেন্স নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে যে ক'টি কথায়, তারই খানিকটা উদ্ধার করছি ঃ

The only deep emotion I occasionally felt in these affairs was gratitude, when all was going well and I I was left, not only peace, but freedom to come and go never kinder and gayer with one than when I had just left another's bed, as if I extended to all other women the debt I had just contracted towards one of them. In any case, however, apparently confused my feelings were, the result I achieved was clear : I kept all my affections within reach to make use of them when I wanted. On my own admission, I could live happily only on condition, that all the individuals on earth, or the greatest possible number, were turned towards me, eternally unattached, deprived of any separate existence and ready to answer my call at any moment, doomed in short to sterility until the day I should deign to favour them. In short, for me to live happily it was essential for the individuals I chose not to live at all. They must receive their life, sporadically, only at my bidding.

এই নির্মম মোহমুক্ত আত্মবিশ্লেষণের পর আর কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না। আমার বিশ্বাস, এই সত্যনিষ্ঠাই পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসকে জীবন-বিরোধিতার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে, সুস্থ জীবন-চেতনায় উদ্ভাসিত করে তুলবে এবং জীবন থেকে হলাহল নয়, অমৃত আহরণ করবে।

# উপন্যাস-পাঠকের প্রত্যয়-সমস্যা

একালের পাঠককে উপন্যাস পড়তে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষতঃ, আধুনিক উপন্যাস এত জটিল ও বিস্তৃত যে কোনো সরল সংজ্ঞায় তাকে বাঁধা যায় না। সাহিত্য-প্রত্যয়ের সমস্যা পাঠকের সমস্যা। উপন্যাসের জটিল প্রকৃতির দক্ষ রূপায়ণের সমস্যা লেখকের সমস্যা। মূলতঃ ছুটি সমস্যা একই উৎস-জাত। আধুনিক সভ্যতা এর মূলে রয়েছে।

বিগত ছুই শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাস পূর্বকালের পৃথিবীর ইতিহাস থেকে চরিত্রবিচারে গুণবিচারে ভাববিচারে সম্পূর্ণপে ভিন্নতর বস্তু। উনিশ ও বিশ শতকের পৃথিবী এত জটিল যে তার একমাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় সাহিত্যকর্ম বলে উপন্যাসকেই গ্রহণ করতে পারি। যন্ত্র-সভ্যতার গর্ভে উপন্যাসের জন্ম, আধুনিক সংশয়ী পরিবেশ তার ধাত্রী, সাহিত্য-প্রত্যয়-চিন্তায় বিক্ষুব্ধ পাঠক তার ভোক্তা। এই অবস্থায় সহজ উপভোগের দিন অবসিত হয়েছে, তা অবশ্যস্বীকার্য। কাহিনীর দিন গত হয়েছে, মিষ্টি মিষ্টি রমণীমোহন রূপকথা-উপকথার ভক্ত পাঠকও আজ অপসৃত।

আধুনিক সভ্যতা পৃথিবীকে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত করেছে যেখানে চিন্তার সংকট ও বিরোধী চিন্তার সংঘর্ষ অনিবার্য। সমাজ-মানস আজ আর সমস্তরের নয়, সমধর্মী নয়। শিল্পীর বিশ্বাসে যেমন নব নব চিন্তার অভ্যুদয় ঘটেছে, তাদের শিল্পরূপায়ণেও ঠিক তেমনই নব নব সংকট দেখা দিয়েছে। আর উপন্যাসের পাঠকের সমস্যাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শনের নানা বিশ্বাস আজ সরল পাঠকহৃদয়কে উত্তেজিত ও তাড়িত করেছে, কোনো বিশেষ প্রত্যয়ভূমিতে আজ পাঠক দাঁড়াতে পারছে না।

চিন্তার ক্ষেত্রে মেরুপ্রমাণ ব্যবধান দেখা দিয়েছে, অথচ বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ মানুষের খুব কাছে এসে পৌঁচেছে। ভৌগোলিক ও ভাষাগত বাধা আজ আর বাধা নয়। পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে রচিত উপন্যাস কয়েক মাসের মধ্যেই অনূদিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে আর রেডিও-টেলিভিশন-সংবাদপত্রের মাধ্যমে চিন্তা-জগতের নানা আলোড়ন নিয়তই সংবেদনশীল পাঠকমনকে স্পর্শ করছে।

বিশ শতকের উপন্যাস পড়লে মনে হয় আধুনিক জগতের সমস্ত জাগতিক ও মানসিক কর্ম ও চিন্তার শিল্পরূপদানের দায়িত্ব উপন্যাসেরই। সেজন্যই রমণীমোহন কাহিনীর দিন আজ আর নেই। উনিশ শতকের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের চরিত্র বদলে গেল। টলষ্টয়, ডষ্টয়েভস্কি, তুর্গেনিয়েফ, ফ্লোবেঅর, বালজাক, জোলা, স্তঁাধাল যে গভীর ব্যাপক জীবন-অন্বেষণের পথে অগ্রসর হলেন, সে জগতে আর বিশুদ্ধ গল্পরস উপভোগের অবসর রইল না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত—উপন্যাসের এই এক শ বছরের ইতিহাসে আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। উনিশ শতকে মার্ক্‌স, বিশ শতকে ফ্রয়েড, শোপেনহাওয়ে, নীট্‌শে, বের্গসঁ, ইয়ুং-এর তত্ত্ব উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে। সমাজতত্ত্ব, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি—সব কিছুই এখানে দেখা গেল। প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বরচিন্তা ও রোমান্টিকতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল ইতিহাস জ্ঞান, সমাজচেতনা ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ। চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা, জীবন সন্ধানের গভীরতা, কৌতূহলের ব্যাপক প্রসার পাঠককে আর শান্তিতে থাকতে দিল না। মানুষের অস্তিত্বের বিশ্লেষণ, তার মানসিক দ্বিধা ও দোলাচলচিত্ততা, তার স্ববিরোধিতা ও আত্মপ্রতারণার নির্মম মূল্যায়নে ঔপন্যাসিক আত্মনিয়োগ করলেন। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের অন্তঃস্তল অনুসন্ধান করেই একালের শিল্পী ক্ষান্ত হলেন না—সর্বমানবিক সত্তার কল্পনাকে পুনর্বিচার ও নবরূপে

সৃজন করলেন। বিভিন্ন মতবাদের প্রভাবে মানুষের প্রতিক্রিয়ারও নিপুণ বিশ্লেষণ করলেন। আজ মোলায়েম রমণীয় সুখপাঠ্য গল্পের দিন গত হয়েছে, অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা ও জীবনের মূল্যায়ন আজ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট। আধুনিক উপন্যাস তাই এ যুগের মহাকাব্য। সার্থক জীবনশিল্পী রূপে এখানে দশজন প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিকের নাম উল্লেখ করতে পারি—টমাস মান, মার্সেল প্রুস্ত, ফ্রান্ৎজ কাফ্‌কা, জেমস জয়স্‌, অলব্যের কামু, জাঁ পল সার্‌ত্‌র্‌, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, আঁদ্রে মোরোয়া, লাকস্‌নেস এবং বরিস পাস্তের-নাক। মননপ্রধান জীবনজিজ্ঞাসাধর্মী উপন্যাসই এ'কালের উপন্যাস। জিজ্ঞাসাবিহীন বিশ্লেষণবিমুখ রমণীমোহন মোলায়েম কাহিনী আজকের দিনে অচল।

এখন প্রশ্ন এই: আধুনিক পাঠক হিসেবে আমাদের জটিল জীবনের শিল্পকর্ম আধুনিক উপন্যাস পড়তে গেলে কোন প্রত্যয়-সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? আজ চিন্তার ঐক্য বা সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার প্রভাব ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। সামাজিক চিন্তার যে সংহতি বা সমজাতিত্ব একদিন খুব প্রবল ছিল, তাও আজ হঠে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে চিন্তার ও সংবেদনের যে অভিন্নতা প্রাক-রেনেসাঁস ইয়োরোপ ও অনাধুনিক ভারতবর্ষে ছিল, আজ তা নেই। অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় অস্থির ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস-পাঠক দেশ, পরিবেশ ও সমাজের গণ্ডীকে স্বতঃই অস্বীকার করেছেন।

আধুনিক শিল্পীমানস নিঃসঙ্গ। কেউ তার সঙ্গী নয়। জীবনের মূল্যায়নে তার কোনো সহযাত্রী নেই। টমাস মান যখন 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন' উপন্যাসে আধুনিক ইয়োরোপের জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণে অগ্রসর হন বা অলব্যের কামু 'দি ফল' উপন্যাসে মধ্য-বিশ শতকের মধ্যবিত্ত মানসের নির্মম ব্যবচ্ছেদ করেন, তখন মান্‌ বা কামুর সঙ্গী কে? কেউ নয়। শিল্পী তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও জীবনজিজ্ঞাসার

প্রেরণায় অগ্রসর হন। কিন্তু পাঠকের সমস্যার সূচনা এইখানেই। পাঠক তো শিল্পজগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা নন, তাকে তার নিজস্ব জাগতিক ও মানসিক ভাবনা নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। সেখানে 'দি ফল' উপন্যাসের নির্মম ব্যবচ্ছেদ সে কতখানি সহ্য করতে পারবে? কিংবা সমস্যা যেখানে আরো জটিল হয়, সেখানে তার মুক্তি কোথায়? অধুনা যে দুটি বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়, সে দুটি হলো—ধর্ম ও রাজনীতি। সাম্প্রতিক ইয়োরোপীয় উপন্যাসে এ দুটীর উপস্থিতি এত প্রকট যে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ক্যাথলিক ধর্ম ও সাম্যবাদ, এ দুটীই পাশ্চাত্য উপন্যাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ভান্দা ভাসিলিয়েভস্কা বা ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ-এ সাম্যবাদ যেমনই প্রবল, ফ্রাঁসোয়া মোরিআক্ বা আঁদ্রে জিদ-এ খৃষ্টীয় নীতিবোধ তেমনই প্রবল। শেষোক্ত দুজনের উপন্যাসে (যেমন জিদের 'The counterfeiters' বা মোরিআকের 'Desert of love') জীবনবিমুখতা লক্ষ্য করা যায়। আবার টমাস মানের উপন্যাসে ('Magic Mountain', 'The Death in Venice') বারবার মৃত্যুর তুহিন্ শীতলতার বর্ণনা বা আদিম পাপবোধের তীব্র শোচনা লক্ষ্য করা যায়; আবার আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'The Old Man and the Sea' উপন্যাসে জীবনমুখী প্রেরণার জয় ঘোষণা শোনা যায়।

এই বিচিত্র বিরোধী জীবনদর্শনের মাঝে পাঠকমন স্বভাবতই বিচলিত হয়। প্রত্যয়ের সমস্যা এখানেই প্রকট রূপে দেখা দেয়। খৃষ্টীয় নীতিবোধে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, মানবের আদিম পাপবোধে ঘৃণা বা আসক্তি, সাম্যবাদে আকর্ষণ বা বিরাগ পাঠকমনকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। এই দ্বিধা ও সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি কোথায়? আধুনিক উপন্যাস-পাঠককে অবশ্যই অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসায় কৌতূহলী ও জীবন-অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে উৎসাহী হতে হবে। অন্যথায় টমাস মান বা

সার্‌তর্‌ বা জিদের গুরুভার চিন্তাপ্রধান মন্থরগতি উপন্যাসের রস উপভোগ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু খৃষ্টীয় নীতিবোধ বা সাম্যবাদের ছক-বাঁধা জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করা কি এতই সহজ? এই প্রত্যয়-সমস্যা একান্তই আধুনিক যুগের সমস্যা, কেননা আধুনিক যুগেই ব্যক্তির অস্তিত্বকে মূল্যদান করা হয়েছে, চিন্তার বিভিন্নতাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং ব্যষ্টিচেতনার প্রাধান্য মেনে নেওয়া হয়েছে। উপন্যাস তো কবিতা নয় এবং কবির অনুভূতিতে যে নির্জনতা ও ধ্যানের প্রশান্তি থাকে, তা ঔপন্যাসিকের শিল্পকর্মে কোনোক্রমেই থাকতে পারে না, বিশেষতঃ এ'কালের উপন্যাস যখন এ-কালের মহাকাব্য। শিল্প-প্রত্যয় ও জীবনপ্রত্যয় সমস্তরের হলে হয়ত সমস্যার সমাধান সম্ভবপর; কিন্তু জিদের জীবনবিমুখতা বা মোরিআকের খৃষ্টীয় নীতি-বোধ আমরা কতখানি মেনে নিতে পারি? আর আমাদের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির ওপর এঁদের শিল্পসাধনার মূল্য নির্ভরশীল নয়, কেননা এঁদের শক্তি আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এ কালের উপন্যাসপাঠক হিসেবে নিজেদের উপস্থিত করতে হলে আমাদের এঁদের সৃষ্ট জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দবেদনার মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। তা হ'লে, সমাধান কোথায়? আলোচনার শেষে দাঁড়ালো কি? সিদ্ধান্ত কি হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে একটি গল্প মনে পড়েছে। সেটীর উল্লেখ করেই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ছেদ টানি।

উইলিয়ম জেম্‌স ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের প্রাণ যা চাইতো, তাই বকে যেতেন। একদিন আর থাকতে না পেরে ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করলে, 'What then, Sir, is your conclusion?

জেম্‌স্‌ উত্তর দিলেন, 'Conclusion? Is the universe concluded that I should come to a conclusion?'

---

## আমাদের অন্য দুটি অনন্য
### ॥ প্রবন্ধ গ্রন্থ ॥

॥ রবীন্দ্রনাথের গান : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

এই গ্রন্থের ভূমিকায় স্বয়ং সৌমেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কুড়ি বছর হতে চললো রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গানগুলির যে সর্বনাশ হয়েছে তা দেখলে বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। অথচ তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে গানগুলিকেই সেরা সৃষ্টি বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই সেরা সৃষ্টিগুলিতে ভেজাল মিশানোর যে আসুরিক প্রয়াস চারিদিকে দেখা যাচ্ছে তাতে ভয় হয় যে·············।'

সেই ভয়ের কথা এই বইতে যেমন রবীন্দ্রনাথের গানের সর্বশ্রেষ্ঠ সমজদার সৌমেন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন, তেমনই কোন্ পথে এর প্রতিকার সেই অভয়বাণীও করেছেন উচ্চারণ। রবীন্দ্র-গীতানুরাগীর কাছে এ গ্রন্থের মূল্য অসীম।

॥ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' : অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ॥

রবীন্দ্রনাথের মানসীর মর্মবাণী, ছান্দসিক অমূল্যধনের লেখায় ছাত্র এবং সাহিত্য পাঠকের উভয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত। মানসী রবীন্দ্রনাথের যৌবনের গীতিরাগের রঙে উজ্জ্বল। নিঃসীম নিরুপম নীল দিগন্তের মতোই তা বুঝবার নয়; বাজবার বস্তু।

অমূল্যধনের রচনায় কাব্যানুভূতির সেই সুরটি ঠিক মতো বেজেছে বলেই তা নীরস হয়নি। সত্য হয়েছে এবং স্বচ্ছ হয়েছে। সর্ব্বজনের হৃদয়ে এ আলোচনা আলো ফেলবার সাফল্যে সার্থক। অদ্বিতীয় মানসীর অপরূপ ব্যাখ্যা।